দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

জীবনী আর্কাইভ- ২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র
২০১৫ ঈসায়ী

সূচীপত্র

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ৪

হাল্লাজ কে? ইসলামের ইতিহাসে তার অবস্থান কী? ১৪

মাসজিদে আকসা উদ্ধার কারীদের প্রতি..... ১৯

'হাশরের ময়দানে দেখা হবে'..... ২৯

মোল্লা মুহাম্মদ উমার মুজাহীদের (রাহিমাহুল্লাহ).....৩৩

আমরা যাদের উত্তরসূরি..... ৪০

আগুন..... ৪৯

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৪

আবু মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল আশয়ারী (রা).....৬৩

হাফসা বিনতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)..... ৭৭

আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের নায়েবে আমীর ও দ ৯৩

আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি..... ১০০

মোল্লা মুহাম্মাদ উমার হাফিযাহুল্লাহঃ ১০৪

আসিম আল মাকদিসির (দা.বা.) জীবনি ১০৮

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-১৯-২০১৫

ভূমিকা :

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ছিলেন মুসলিম ইতিহাসে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান সেনাপতি। যিনি রণক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও মেধার দ্বারা বাতিলের শক্তি মূলোৎপাটন করে তাওহীদের ঝান্ডাকে বুলন্দ করেছিলেন। মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আববাস মাহমুদ আল-আক্কাদ 'আবকারিয়াতু খালিদ' নামক গ্রন্থে তাঁর সামরিক ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে বলেন, 'সামরিক নেতৃত্বের সব গুণাবলীই খালিদ (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল। বাহাদুরী, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন, অত্যধিক ক্ষিপ্রতা এবং শত্রুর উপর অকল্পনীয় আঘাত হানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় (তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদ : আব্দুল কাদের (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ; ১৯৯৪ খ্রিঃ, ১/১৮৮ পৃঃ)। নিমেণ এ কুশাগ্রবুদ্ধি মহান সেনাপতির সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হ'ল।

নাম ও জন্ম :

মূল নাম খালিদ, উপনাম আবু সুলায়মান ও আবুল ওয়ালীদ। লক্বব সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী)। মূতার যুদ্ধে অসমান্য অবদানের জন্য তিনি 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

খালিদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, নবুয়তের ১৫ অথবা ১৬ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। আর রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় তাঁর ২৪ অথবা ২৫ বছর বয়স হয়েছিল।

বংশ পরিচয় :

পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা। মাতা লুবাবা আস-সুগরা। যিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত ময়মুনা বিনতুল হারিছের বোন (আছহাবে রাসূল ২/৬৩ পৃঃ)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) তাঁর খালু। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে-খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম আল-কুরাশী আল-মাখযুমী (আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, ২/৯৮ পৃঃ)।

ইসলাম গ্রহণ :

রাসূলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) খালিদ ইবনু ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের জন্য দো'আ করতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, সালামা ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন'। এ দো'আর বরকতে আল্লাহর রহমতে ৭ম হিজরী সনে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেন (তাফসীর ইবনু কাছীর ১৬৩ পৃঃ)। তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আসমাউর রিজালের বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি ৮ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা সবার জানা কথা। এটা অষ্টম হিজরীর ঘটনা। অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়, আমর হাবশা থেকে ফেরার পথে খালিদ এবং উছমান ইবন ত্বালহার সাথে সাক্ষাত হয় এবং তারা তিনজন একত্রে ইসলামের গ্রহণ করে। এতে বোঝা যায় এরা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকই সবকিছু ভাল জানেন (আর-রাহীকুল মাখতূম ৩৫৭ পৃঃ)। হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকালে বলেছিলাম আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করে জীবনে যত পাপ করেছি হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা ক্ষমার জন্য দো'আ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) তাকে বলেছিলেন, 'ইসলাম অতীতের সকল গুনাহসমূহকে মুছে দেয়'। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))! আমি এ কথার উপর বায়'আত করলাম (রিজালুন হাওলার রাসূল, ২৮৪ পৃঃ)।

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে খালিদ :

হিজরী নবম সনে রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) খালিদকে তাওহীদের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে বনী জুজাইম গোত্রে প্রেরণ করেন। খালিদের দাওয়াতের ফলে বনী জুজাইম গোত্র ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ তারা তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে না পারায় খালিদ তাদের ভুল বোঝেন। তিনি তাদেরকে হত্যার আদেশ দেন। ফলে সে গোত্রের বহুলোককে হত্যা করা হয়। রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বিষয়টি অবহত হ'লে তিনি ভীষণ দুঃখিত হন। তিনি হাত উঠিয়ে দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ খালিদ যা করেছে এ ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠান এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। এমনকি তাদের নিহত প্রাণীগুলোরও ক্ষতিপূরণ দেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, পৃঃ ৪৫০)।

১০ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) খালিদ (রাঃ)-কে নাজরানের বনু আব্দিল মাদ্দাদের গোত্রে পাঠান। যেহেতু খালিদ বনু জুজাইমের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কঠিন ভুল করেছিলেন সেজন্য রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) এ যাত্রার পূর্বে তাকে বিশেষভাবে নছীহত করে বলেন, 'কেবল ইসলামের দাওয়াতই দিবে, কোন অবস্থাতেই তলোয়ার উঠাবে না। তিনি এ নছীহত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেন। তার দাওয়াতে মাদ্দান গোত্র ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়। এ সকল নওমুসলিমদের তিনি দ্বীনী তা'লীম ও তারবিয়াত শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর দরবারে নিয়ে আসেন। একই বছরে ইয়ামানবাসীর নিকটে দাওয়াত প্রচারে খালিদ ও আলী (রাঃ)-কে পাঠান। তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইয়ামানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে (আসহাবে রাসূল, ২/৬৬ পৃঃ)।

মূর্তি ভাঙ্গলেন খালিদ :

জাহেলী যুগে আরববাসীদের মূর্তিপূজার একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল উজ্জা। রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) খালিদকে ঐ কেন্দ্রীয় মূর্তিটি ধ্বংসের জন্য পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে নিমেণর পংক্তিটি আবৃতি করতে করতে তাকে মাটির সাথে গুড়িয়ে দেন, 'ওহে উজ্জা তুই অপবিত্র, আমরা তোকে অস্বীকার করি। আমি দেখেছি আল্লাহ তোকে অপমান করেছেন'।

সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারী উপাধি লাভ :

মূতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতিকে হারিয়ে মুসলিম বাহিনী যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন তারা খালিদ ইবন ওয়ালীদকে সিপাহসালার মনোনীত করেন। অতঃপর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে খালিদ অসীম বীরত্ব ও অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। মুহাম্মাদ ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) তাঁর এই তেজস্বীতা ও বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

রণাঙ্গনে খালিদ :

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের মাত্র দুমাস পরেই সর্বপ্রথম মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ মূতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যায়েদ ইবনু হারিছা (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নির্দেশ দেন যায়েদ নিহত হ'লে জাফর আর জাফর নিহত হ'লে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। যখন উভয়পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হ'ল তখন তিন সেনা কমান্ডারই অতুলনীয় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর জনতার মতামতের ভিত্তিতে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) সেনা কমান্ডার নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি অসীম বীরত্ব দেখিয়ে শত্রু পক্ষকে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে দেন। তিন তিনজন সুযোগ্য সেনা নায়ককে হারিয়েও মুসলমানরা অবশেষে বিজয় লাভ করেছিল (আর-রাহীকুল মাখতুম ৪০১-৪০২ পৃঃ)। ছহীহ বুখারীতে স্বয়ং খালিদ ইবনু ওয়ালিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। এরপর আমার একটি ইয়ামানী তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল (ছহীহ বুখারী, মূতার যুদ্ধ অধ্যায় ২/৭১১ পৃঃ)।

১০ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের মূহূর্তে ছাহাবাগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) খালিদকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন মক্কার ঢালু এলাকায় প্রবেশ করেন। নবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) খালিদকে বলেন, যদি কুরাইশরা কেউ তোমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহ'লে তুমি তাকে ক্বতল করবে। এরপর মক্কায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে। খালিদ (রাঃ) রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের পথে যেসব পৌত্তলিক বাঁধা

হয়ে এসেছিল তাদেরকে মুকাবেলা করে হত্যা করেন। অতঃপর খান্দামা নামক স্থানে খালিদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে উচ্ছৃঙ্খল কতিপয় কুরাইশ পক্ষ মুখোমুখি হয়। কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলে। এতে বারো জন কুরাইশ নিহত হয়। এ ঘটনায় কুরাইশদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হাম্মাম ভয়ে ভীতু হয়ে ছুটে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। এভাবে খালিদ (রাঃ) মক্কার দক্ষিণাংশের সমস্ত বিপর্যয় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করে রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর সাথে মিলিত হন (আর-রাহীকুল মাখতুম ৪১৯ পৃঃ)।

ভন্ডনবীদের দমনে খালিদ :

রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর ইন্তেকালের পর সমস্ত আরবে বিদ্রোহের দানা বাঁধতে থাকে। একদিকে ইসলাম ত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারী, অপর দিকে ভন্ডনবীদের উৎপাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই ফেৎনাবাজদের শিরদাড়া গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে আবূ বকর (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবীদের অনুরোধে তিনি তা করেননি বরং মদীনাতেই রয়ে গেলেন। তিনি গোটা সেনাবাহিনীকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১টি ভাগের দায়িত্ব দিলেন খালিদকে। খালিদকে মদীনা থেকে বিদায় দেওয়ার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমার সম্পর্কে আমি রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-কে বলতে শুনেছি, 'খালিদ আল্লাহর একটি তরবারী-যা আল্লাহ কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। খালিদ আল্লাহর কতইনা ভাল বান্দা' (রিজালুন হাওলার রাসূল ২৯৩ পৃঃ)। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভন্ডনবী তুলায়হার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তুমুল যুদ্ধ চলছে। প্রতিটি সংঘর্ষে তুলায়হা পরাজয় বরণ করছে। এমন সময় তুলায়হা একদিন তার আপনজনদের জিজ্ঞাসা করল আমাদের এত বিপুল সৈন্য থাকতেও আমাদের এমন শোচনীয় পরাজয় কেন? তার সঙ্গীরা তাকে বলল, আমাদের প্রত্যেকেই চায় তাঁর সাথী আগে মারা যাক আর তারা প্রত্যেকেই চায় যে সে তাঁর সঙ্গীর আগে মৃত্যুবরণ করুক (হায়াতুছ ছাহাবা ৩/৬৯৩ পৃঃ)। অতঃপর খালিদ তুলায়হার সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করেন এবং ৩০ জনকে বন্দী করেন। তারপর তিনি মূসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মুসাইলামা হামযা (রাঃ)-এর

হত্যাকারী ওয়াহশী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়ে চির বিদায় নেয় (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ২/৬৭ পৃঃ)। 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থকার বলেন, ভন্ড নবীদের ফিৎনা নির্মূল করার পর হযরত খালিদ (রাঃ) যাকাতদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মুরতাদদের দিকে ধাবিত হন এবং তাদের উপর কঠিনতর আঘাত হানেন। তাদের কিছু মারা যায় এবং কিছু ধৃত হয়। আর অবশিষ্টরা তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে' (তারীখুল খুলাফা, ৭২ পৃঃ)।

অপরাজিত এক বীর সিপাহসালার খালিদ :

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের পর খালিদ ইরাক অভিমুখে রওয়ানা দেন। আনবার, আইনুত তামুর, দুমা, হীরা ও সোনা প্রভৃতি অঞ্চল অত্যন্ত সাহসিকতার বিজয় লাভ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) সর্বশেষ যুদ্ধ করেন ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে। ফোরাতের এক তীরে মুসলিম বাহিনী অপর তীরে ইরাকী বাহিনী। ইরাকীদের প্রস্তাবমতে তাদেরকে নদী পার হবার সুযোগ দিলে তারা নদী পার হয়। মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীকে তিন দিক ঘিরে ফেলে। তাদের পিছনে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা বিশাল নদী। সামনে মুসলিম সৈন্যদের তরবারীর ভেদ। পিছনে সুবিশাল সমুদ্র। পালানোর কোন পথ নেই। সামনে অতিক্রম করলে তরবারীর আঘাত আর পিছনে ফিরে গেলে ডুবে মরা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। অতঃপর মুসলিম বাহিনী শত্রু পক্ষকে কঠিনভাবে আক্রমণ করে। ফলে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। পরিশেষে যুদ্ধ বিজয়ের পর খালিদ গোপনে হজ্জ করতে যান (আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৬৮ পৃঃ)।

ইরাক জয়ের পরপরই খালিদ (রাঃ) খলীফার নির্দেশে বসরায় যান ও পূর্বে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করেন। খালিদ সেখানে পৌঁছেই বসরায় আক্রমণ করেন। তার আক্রমণে হতভম্ব হয়ে বসরাবাসী ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাদের শান্তি চুক্তি করে। এরপর খালিদ সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। সিরিয়ায় অভিযানের প্রথমেই খালিদ দামেশক অবরোধ করেন। সেখানে খালিদ (রাঃ) প্রায় ছয়মাস অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারেন নি। এ সময় এক পাদ্রীর পুত্র সন্তান জন্মের কারণে আনন্দে নগরীর অধিবাসীরা মদপানে মত্ত ছিল। তাই সময় বুঝে একদিন রাতে খালিদ তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেন ও দ্বাররক্ষীদের হত্যা করেন। ফলে

নগরের প্রধান ফটক মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত হয়। অকস্মাৎ আক্রমণে ভীত হয়ে তারা তরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। এ অভিযানে আবু ওবায়দা, আমর ইবনুল 'আছ ও সুরাহবিল (রাঃ) খালিদকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

দামেশক বিজয়ের পর খালিদ (রাঃ) জর্দান অভিমুখে রওয়ানা দেন এবং জর্দানের নিকটবর্তী ফিহল নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। রোমানরা সেখানে অযৌক্তিক প্রস্তাব সম্বলিত সন্ধি প্রস্তাব দেয়। মুসলমানরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে রোমানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দামেশক জর্দান ও হিমসের ন্যায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের পতনে রোমান সম্রাট ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ২,৪০,০০০ জনের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন।

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান বিভিন্ন কমান্ডার পৃথকভাবে সৈন্য পরিচালনা করছেন। তখন খালিদ (রাঃ) যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এক গুরুগম্ভীর ভাষণ প্রদান করেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বলেন, 'আজকে এ দিন আল্লাহর নিকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। তোমরা গর্ব অহংকার থেকে বিরত থাক। তোমরা খালেছভাবে যুদ্ধ কর। তোমাদের কাজের জন্য প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা কর। এসো আমরা নেতৃত্ব ভাগাভাগি করি। কেউ আজ কেউ আগামী ও কেউ পরশু আমীর হই। আর আজকের দিন আমার উপর ছেড়ে দাও'। অতঃপর তাঁর এই তেজোদীপ্ত বক্তব্য সকলে সমর্থন দিল। প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে খালিদ (রাঃ) মুসলিম সেনাদলকে এমনভাবে বিন্যস্ত করলেন যে আরবরা কোনদিন এমন বিন্যস্তকারণ চোখে দেখেনি (আছহাবে রাসূলদের জীবনকথা ২/৬৯)। অতঃপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। রোমানরা এমনভাবে আক্রমণ করল যে আরবরা এরকম বিপদে ইতিপূর্বে কখনও নিমজ্জিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর মাঝখানের দায়িত্বে ছিলেন কাকা ও ইকরামা (রাঃ)। খালিদ তাদেরকে ও সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ফলে যুদ্ধ সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করল। হযরত খালিদও তীব্র আক্রমণ চালালেন। তিনি যে দিক গেলেন সে দিকের রোমান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের শোচনীয় পরাজয় হল। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, এ যুদ্ধে লক্ষাধিক রোমান সৈন্য নিহত হয়।

এরপর মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। এ অবরোধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধানদের মধ্যে খালিদও ছিলেন একজন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীরা বাঁচার কোন পথ না পেয়ে স্বয়ং উমার (রাঃ)-এর নিকট সন্ধিচুক্তি করার প্রস্তাব দেন। তাদের অনুরোধে উমার (রাঃ) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এভাবেই প্রত্যেক যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সুতীক্ষ্ম ও সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদান করে ইসলামের বিজয় পতাকা বিশ্বের ময়দানে উড্ডীন করেন।

প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণঃ

খলীফা উমার (রাঃ) খালিদ (রাঃ)-কে ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন। অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) সর্বত্র ঘোষণা দেন যে, 'আমি খালিদকে আস্থাহীনতা, ক্রোধবশতঃ বা এ জাতীয় কোন কারণে অপসারণ করিনি। শুধুমাত্র এ কারণে পদচ্যুত করেছি যে, মুসলমানরা জেনে নিক যে, খালিদের শক্তির ওপর ইসলামের বিজয়সমূহ নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামের বিজয় আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল (ইবনুল আছীর, তারিখে কামিল, ২/৪১৮ পৃঃ)।

অপসারণের কারণঃ

তার অপসারণের কারণ সম্পর্কে ইতিহাসে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমত, মুসলিম অমুসলিম সকলেই ধারণা করত যে, খালিদ বিন ওয়ালিদের কারণে প্রত্যেক যুদ্ধে বিজয় হচ্ছে। খলিফা এ কুধারণা দূর করার জন্য তাকে অব্যাহতি দেন (আছহাবে রাসূল ২/৭৩ পৃঃ)।

দ্বিতীয়ত, তাঁর অব্যাহতির ঘটনা কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ (রাঃ)-এর ব্যয় কখনো কখনো সীমা অতিক্রম করত। মাঝে মাঝে তিনি বিপুল পরিমাণে সম্পদ দান করতেন। তিনি কবি আশ'আছ ইবনে ক্বায়েসকে ১০ হাজার দিরহাম দান করে দেন। খলিফা বিষয়টি অবগত হয়ে আবূ উবায়দাকে জিজ্ঞেস করতে বলেন, তিনি কোন খাত থেকে এ অর্থ ব্যয় করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন নিজের অর্থ থেকে। তারপর তিনি খলীফার নির্দেশ পড়ে শোনান। অতঃপর খালিদ (রাঃ) বলেন, আমি খলীফার ফরমান শুনলাম ও মানলাম। কারো মতে এ ঘটনা ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে ঘটে (আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ২/৭২ পৃঃ)।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :

খলীফার উক্ত অব্যাহতি আদেশ তিনি অবনত মস্তকে মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিক বেশে বাকি যুদ্ধে শরীক থাকেন। তারপর খলীফা তাকে সিরিয়ার রাহা, হিরাত, আমদ এবং লারতার অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ২/৭২ পৃঃ)। অতঃপর তিনি খলীফা প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে দ্রুত সিরিয়ায় গমন করেন। তিনি ইয়াযীদকে লেবানন, আমর (রাঃ)-কে জেরুজালেম, সুরাহবিলকে জর্দান অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং তিনি দ্রুত গতিতে বলবেক, এডেসাম, আলেপ্পো, কিন্নিসিরিন প্রভৃতি স্থান দখন করে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর এভাবে তিনি একজন সুদক্ষ সেনানায়ক থেকে একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রীয় শাসকে পরিণত হন। সেখানে কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ অল্প সময়েই তিনি মোট ১২৫ মতান্তরে ৩০০ টি ছোট-বড় যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তবে মজার বিষয় হল তিনি কোন যুদ্ধেই পরাজিত হননি (ইবনুল আছীর, তারীখে কামিল, ৪১৮ পৃঃ)।
ইলমে হাদীছে তাঁর অবদানঃ

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে প্রায় মৃত্যু অবধি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করেছেন। মহানবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর সান্নিধ্যে থাকার খুবই কম সুযোগ পেয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, জিহাদের ব্যস্ততা আমাকে কুরআনের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে (আল-ইছাবা, ৪১৫ পৃঃ)। তারপরেও তিনি এ শিক্ষা থেকে একেবারে বঞ্চিত থেকেছেন তা নয়। বরং তিনি রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর সাথে যতটুকু সময় কাঁটাতে পেরেছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি মোট ১৮ মতান্তরে ১৭টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহি হাদীছ ২টি এবং বুখারী এককভাবে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ফতওয়া বিভাগে সাধারণত বসতেন না। তাই তার ফতওয়ার সংখ্যা দুটির বেশি পাওয়া যায় না।

ইন্তেকালঃ

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ৬৩৯ খ্রিঃ মোতাবেক হিজরী ২১ মতান্তরে ২২ সালে কিছুদিন অসুস্থ হন এবং ৬০ বছর বয়সে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ‘হিমছ’-এ মৃত্যুবরণ করেন। তবে এ মত ঠিক নয় বলে ধারণা করা হয়। কারণ খলীফা উমর (রাঃ) তাঁর যানাযায় উপস্থিত

হন বলে ধারণা করা হয় (উসদুল গাবা ১/৯৫)। খালিদের মৃত্যুতে উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেছিলেন, 'নারীরা খালিদের মত সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।' এমন কি তাঁর মৃত্যুতে খলীফা নিজে কেঁদেছিলেন (রিজালুন হাওলার রাসূল, ৩০৫ পৃঃ)।

উপসংহারঃ

খালিদ (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের আসনে সমাসীন। সামরিক ক্ষেত্রে এবং রণাঙ্গনে তাঁর যে অবদান তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পাশাপাশি এ কথাও স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, তিনি একজন যোগ্য শাসকও ছিলেন। পরিশেষে 'খালিদ সাইফুল্লাহ' নামক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি। সেখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ তা'আলা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর উপর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ভুলবার নয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ, আমরা যেন তার জীবনীর বিভিন্ন ঘটনাবলীকে নিয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কারণ মুসলিম জাতির তাঁর গুণাবলী অবলম্বনের মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা নিহিত'। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৯৫

হাল্লাজ কে? ইসলামের ইতিহাসে তার অবস্থান কী?

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-১৯-২০১৫

আল-হামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসাআল্লাহ তা'আলার জন্য)

হাল্লাজের মূল নাম হলো : হুসাইন ইব্নু মানসূর আল-হাল্লাজ।

উপনাম: আবু মুগীস। কেউ কেউ বলেন: আবূ 'আব্দিল্লাহ্।

সে বড় হয়েছে ওয়াসিত্ব শহরে। কেউ কেউ বলেন, তাসতুর শহরে। সে একদল সূফীর সাথে চলাফেরা করত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল সাহল আত-তাসতুরী, জুনাইদ, আবুল হাসান আন-নূরী প্রমূখ।

সে অনেক দেশ ভ্রমন করেছিল। তন্মধ্যে মক্কা, খুরাসান ও ভারত অন্যতম। আর ভারত থেকেই সে জাদু শিক্ষা করেন। জীবনের শেষভাগে বাগদাদে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়।

হাল্লাজ ভারত থেকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে। সে ছিল কুট-কৌশল ও প্রতারণাকারী লোক। সে এ জাদু, প্রতারণা দ্বারা বহু মূর্খ লোকদের ধোঁকা দিয়েছিল এবং তাদেরকে তার দিকে আকর্ষিত করেছিল। এমনকি তারা তার সম্পর্কে ধারণা করতো যে, তিনি সমস্ত আওলিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের নিকট সে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং প্রচার করে থাকে যে, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, তার আকীদা ছিল খৃস্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের মত আর সে বলতো খ্রিস্টানদের কথাই। যার বর্ণনা অচিরেই আসছে।

৩০৯ হিজরী সনে তার স্বীকারোক্তি ও তার বিরুদ্ধে অন্যদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাকে কাফির ও যিনদীক (মুনাফিক/নাস্তিক সাব্যস্ত করে বাগদাদে হত্যা করা হয় এবং

তার যুগের সকল আলিম তাকে হত্যা করার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কারণ সে কুফরি ও নাস্তিক কর্মকাণ্ড করেছিল।

তার কিছু কথাবার্তা নিম্নরূপ :

১. প্রথমেই সে নবূওয়াতের দাবি করেছিল, তারপর তার এ অবস্থাটি আরো প্রকট হয়ে গেল যে, সে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে বসলো। আর সে বলতো : আমিই আল্লাহ্। আর তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দিত। অতঃপর তার স্ত্রী তাকে বললো : সেকি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করবে? তখন সে বলল : আসমানে একজন ইলাহ রয়েছে, আর যমীনের অন্য একজন ইলাহ রয়েছে।

২. সে হুলুল ও ইত্তেহাদের কথা বলতো : অর্থাৎ সে বলতো, আল্লাহ তার মধ্যে প্রবেশ করেছে; ফলে আল্লাহ্ ও সে একই সত্ত্বা হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ। সে যা বলত তা থেকে আল্লাহ কতই না উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আর এ কারণেই প্রাচ্যবিদগণ তার অনুসারী হয়েছিল; কেননা তারাও হুলুলী বা আল্লাহ মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো, সে হিসেবে সে হুলুলের ব্যাপারে খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের অনুগামী ছিল। কারণ, খৃষ্টানরা 'ঈসা আ. সম্পর্কে এ বিষয়ে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা আলাইহিস আলাইহি সালামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এ কারণে হাল্লাজ লাহূত তথা ঐশী সত্তা ও নাসূত তথা মানবিক সত্তার কথা বলেছিল যেমনটি খ্রিস্টানরা বলে থাকে। এ ব্যাপারে তার উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো :

سبحان من أظهر ناسوته + سر لاهوته الثاقب

ثم بدأ في خلقه ظاهرا + في صورة الآكل والشارب

"ঐ সত্ত্বা কতই মহান, যিনি তার গোপন প্রদিপ্ত ঐশী সত্তাকে মানবিক সত্তায় প্রকাশ করেছে।

অতঃপর সে তার সৃষ্টিতে প্রকাশিত হলেন, খাদ্যগ্রহণকারী ও পানকারীরূপে।" [নাউযুবিল্লাহ]

যখন ইব্নু খাফীফ নামক সুফীদের মধ্য থেকে একজন সুফী এ কবিতা শুনলেন

তখন বললেন: এ কথার বক্তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ পতিত হোক। অতঃপর তাকে বলা হলো : এটি হাল্লাজের কবিতা। তখন তিনি বললেন, যদি এটি তার বিশ্বাস হয় তাহলে সে কাফির।

৩. সে একবার কোনো একজন পাঠকের মুখে শুনতে পেল যে, সে কুর'আন পাঠ করছে। তখন সে বলল : আমিও অনুরূপ রচনা করতে পারি। (নাউযুবিল্লাহ)
৪. তার উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো :

عقد الخلائق في الإله عقائدا + وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه.

"সৃষ্টিকুল তাদের ইলাহ সম্পর্কে বহু রকমের আকীদা পোষণ করে থাকে, আমি তাদের সকলের আকীদা-ই পোষণ করে থাকি।" [নাউযুবিল্লাহ]

তার এ কথা এবং তার সাথে বনী আদমের মধ্যেকার সকল ভ্রষ্ট-নষ্ট দল ও ফির্কাসমূহের কুফরী আকীদা বিশ্বাসের মত আকীদা পোষণের স্বীকারোক্তি ও তাদের বিশ্বাসের মত বিশ্বাস পোষণ নিঃসন্দেহে এ সবকিছুই কুফরী। তাছাড়া তার এ কথায় রয়েছে স্ববিরোধিতা; যা কোনো বিবেক গ্রহণ করতে পারে না; কীভাবে তাওহীদের বিশ্বাস ও শির্ক এক সাথে থাকতে পারে? [নাউযুবিল্লাহ]

৫. তার এমন কিছু কথা রয়েছে যা ইসলামের রুকনগুলোকে বাতিল করে দেয় ও তার ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। আর তা হলো সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ।

[নাউযুবিল্লাহ]
৬. সে বলত: নবী-রাসূলদের আত্মা তার সঙ্গী- সাথী ও ছাত্রদের শরীরে ফিরে এসেছে। আর এ কারণেই তাদের একজনকে সে বলতো: তুমি নূহ, অন্য একজনকে বলতো : তুমি মূসা, অন্যজনকে বলতো : তুমি মুহাম্মাদ।

[নাউযুবিল্লাহ]
৭. যখন তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো তখন সে তার সাথী বা ভক্তদেরকে বলল: তোমরা এতে হতাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট ত্রিশদিন পর আবার ফিরে আসবো। অতঃপর তাকে হত্যা করা হলো। কিন্তু সে আর কখনও ফিরে আসেনি।

আর এ কারণেই তার বিভিন্ন কথাবার্তা ও অন্যান্য কার্যক্রমের কারণে তার যুগের আলিমগণ ঐকমত্যে তাকে কাফির ও নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণেই ৩০৯ হিজরী সনে বাগদাদে তাকে হত্যা করা হয়। তাছাড়া সূফীগণের অধিকাংশই তার নিন্দা করেছেন, তারা তাকে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেছেন। যে সকল সূফী তার নিন্দা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, জুনাইদা আল-বাগদাদী রহ। আর আবুল কাসিম আল-কুশাইরী তার লিখিত গ্রন্থে অনেক সূফী মাশায়েখদের নাম উল্লেখ করলেও তার নাম উল্লেখ করেন নি।

তাকে হত্যা করার জন্য যিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে বিচারের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাকে তার উচিত শাস্তিদণ্ড হত্যা করার বিধান দিয়েছেন, তিনি হলেন কাযী আবূ 'উমর মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-মালেকী (রহ.)। উক্ত কাযী সাহেবের প্রশংসার সময় আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) বলেছেন: তিনি যে একটি বড় ও সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটি ছিল, হুসাইন ইবন মানসূর আল-হাল্লাজকে হত্যা করার জন্য দেওয়া রায়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১১, পৃ. ১৭২।) এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (রহ.) বলেন : "যে কারণে হাল্লাজ নিহত হলো; যে কেউ হাল্লাজের সে সব মতবাদের প্রতি বিশ্বাস করবে সে মুসলিমদের ঐকমত্যে কাফির ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। কেননা মুসলিমরা তাকে হত্যা করছে তার বিশ্বাসে হুলুল ও ইত্তিহাদ এবং নাস্তিকদের মতবাদ থাকার কারণে। যেমন তার কথা : আমি আল্লাহ্। তার আরো কথা হলো: এক ইলাহ আসমানে, অপর ইলাহ যমীনে। ... প্রকৃতপক্ষে হাল্লাজ ছিল ভেল্কীবাজ, তার ছিল কিছু জাদু; আর তার দিকে সম্পৃক্ত করা কিছু কিতাব আছে যাতে জাদুর সমাহার রয়েছে। মোটকথা: উম্মতের মধ্যে এ কথায় কোনো বিরোধ নেই যে, যে কেউ বলবে যে মানুষের মধ্যে আল্লাহর অনুপ্রবেশ ঘটে, মানুষ ও আল্লাহ একীভূত হয়ে যায়, মানুষও ইলাহ হতে পারে, আর এটি ইলাহদের একজন, এ জাতীয় বিশ্বাস যে কেউ পোষণ করবে, সে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত হবে, তার রক্ত প্রবাহ বৈধ হয়ে যাবে। বস্তুত এ কারণেই হাল্লাজকে হত্যা করা হয়েছে।" (মাজমূ' আল-ফাতাওয়া, খ. ২, পৃ. ৪৮০।)

তিনি আরো বলেন : "আমরা জানি না যে, মুসলিম ইমামদের কেউ হাল্লাজকে ভালো বলেছেন। আলেমগণের কেউ তো নয়ই এমনকি সূফী মাশায়েখদের কেউও

নয়। কিন্তু কিছু মানুষ তার ব্যাপারে মত প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছে কারণ, তারা তার কার্যক্রম বুঝতে পারে নি। (মাজমূ‘ ফাতাওয়া, খ. ২, পৃ. ৪৮৩।)

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য :

খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ. ৮, পৃ. ১১২-১৪১;

ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম, খ. ১৩, পৃ. ২০১-২০৬;

আয-যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা’, খ. ১৪, পৃ. ৩১৩-৩৫৪;

ইবন কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ. ১১, পৃ. ১৩২-১৪৪।

বস্তুত আল্লাহই সঠিক পথের দিশা দান করেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৯৬

মাসজিদে আকসা উদ্ধার কারীদের প্রতি

কাল পতাকা

Senior Member

০৯-০৬-২০১৫

মাসজিদে আকসা উদ্ধার কারীদের প্রতি

بالأمس القريب

سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه سؤالا لفرسانه ان تمنوا

فتمني البعض كنزا لينفقه

و تمنى أخر ذهبا لينفقه

فقالوا تمنى انت يا أمير المؤمنين

أتمنى ملأ هذا البيت فرسانا كأبى عبيدة

উমর রা: একদিন তার ঘোড়সওয়ারদেরকে বললেন: তোমরা আকাংক্ষা কর?
কিছু লোক খরচ করার জন্য সম্পদ দিতে বললেন অন্যরা স্বর্ণ।
তখন তারা বললেন : হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনি আকংক্ষা করুন।
উমর রা বললেন : আমি সর্বদা এই ঘর (মাসজিদে আকসা) পরিপূর্ণ দেখতে চাই
আবী উবাইদার মত ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা।

عذرا ياقدسنا الأسير

فليس معنا و لا بيننا ما تمناه الامير

و ليس فى السحات من يغار و يعلن النفير

و لا حتى من يدعي صلاحا الى الاقصي يسير

عفوا

لا تظن ان ما قلته ادعاءا و تبريرا

এই জীবনীর মধ্যে একজন পূর্ণ মুসলিম মুজাহিদের মানহাজ ফুটে উঠেছে।
আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেছেনঃ 'লিকুল্লি উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া আমীনু হাজিহিলউম্মাহ আবু উবাইদা- প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিমজাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।' তিনি ছিলেন উজ্জ্বলমুখমণ্ডল, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও দীর্ঘদেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালোবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের ন্যায়। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'আমীন'- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।তাঁর পুরো নাম আমীল ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল –ফিহরী আল কুরাইশী। তবে কেবল আবু উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম উর্ধ পুরুষ 'ফিহরের' মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মাও ফিহরী খান্দানের কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারের রা. মন্তব্য হলঃ 'কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন- আবু বকর সিদ্দিক, উসমান ইবন আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন আবু উবাইদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত আবু বকরের মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন মাজউন, আল-আরকাম ইবন

আবিল আরকাম ও তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. দরবারে হাজির হন। সেখানে যারা সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামী ইমারতের প্রথম ভিত্তি। মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদা শরীক চিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরাতের পর তিনিও মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় সা'দ বিন মুয়াজের সাথে তাঁর 'দ্বীনী মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার উর্ধে। যুদ্ধের ময়দানে এমন বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশরিকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিকবিদিক পালাতে থাকে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর তিনিও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও আবু উবাইদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃতপক্ষে আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা আবু উবাইদা ও তাঁর পিতার শানে নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল করেন।

'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) বিরুদ্ধাচরণ করেছে- তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তা'আলা ঈমান

দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' (আল মুজাদিলা- ২২)

আবু উবাইদার এরূপ আচরণে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও ঈর্ষা পোষণ করতেন। মুহাম্মাদ ইবন জাফর বলেনঃ 'খৃস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম). দরবারে হাজির হয়ে বললো- হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার মনোনীত কোন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বললেনঃ 'সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।' হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব বলেনঃ 'আমি সেদিন সকাল সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মত আর কোন দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম). এ প্রশংসার পাত্রটি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আমাদের সাথে জোহরের নামায শেষ করে ডানে বায়ে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেনঃ 'তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টির ফায়সালা করে দাও।' আমি তখন মনে মনে বললামঃ আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

আবু উবাইদা কেবল একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূত করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বদর যুদ্ধের প্রাক্*কালে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. একদল সাহাবীকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। পাথেয় হিসাবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন আবু উবাইদা তাঁর প্রত্যেক সংগীকে মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ অষ্টম হিজরীতে রজব মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আবু উবাইদার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া তাঁদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর। এই একটি খেজুর খেয়েই তাঁর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ কোথায়, মুহাম্মাদ কোথায়....'। তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গণ্ডদেশে বর্মের দুটি বেড়ী বিঁধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক বেড়ী দু'টিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। আবু উবাইদা তাঁকে বললেন, 'কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।' তিনি ছেড়ে দিলেন। আবু উবাইদা ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ী দু'টি তুললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. হয়ত কষ্ট পাবেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন আবু বকর রা. মন্তব্য করলেনঃ 'আবু উবাইদা সর্বোত্তম ব্যক্তি।' খন্দক

ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন। খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'জাতুস সালাসিল' অভিযানে হযরত আমর ইবনুল আসের বাহিনীর সাহায্যের জন্য দু'শ' সিপাহীসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আবু উবাইদাকে পিছনে পাঠান। তাঁরা জয়লাভ করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) সফরসংগী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেনঃ 'ওহে আনসারদের সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়োনা।' এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করি। আমি রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলতে শুনেছিঃ 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' এর জবাবে আবু উবাইদা বললেনঃ 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারিনা যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।' একথার পর আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা হল। আবু বকরের খলীফা হবার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন ।আবু বকরের পর হযরত উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন।

হযরত আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবু উবাইদাকে হিমস, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে দিমাশ্*ক, শুরাহবীলকে জর্দান এবং 'আমর ইবনুল আসকে ফিলিস্তীনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন আবু উবাইদাকে। দিমাশ্*ক, হিমস, লাজেকিয়া প্রভৃতি শহর বিজিত হয় আবু উবাইদার হাতে। ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। 'আমর

ইবনুল 'আসের আহ্*বানে সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা খোদ খলীফা 'উমারের সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে আবু উবাইদাই সে কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 'জাবিয়া' পৌঁছলে আবু উবাইদাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশ্*কের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে খলীফা উমার আবু উবাইদাকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 'তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমীনুল উম্মাত তোমাদের ওয়ালী।'

আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়। খলীফা হযরত উমার রা. নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাজধানী মদীনা থেকে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আবু উবাইদা সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের পক্ষে মত দিলেন। হযরত উমার সবাইকে আহ্*বান জানালেন তাঁর সাথে আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা বেঁকে বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আ ফিরারুম মিন কাদলিল্লাহ- একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন নয়?' খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেনঃ 'আফসুস! আপনি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। আবু উবাইদা তাঁর বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার মদীনা পৌঁছে দূত মারফত আবু উবাইদাকে একখানা পত্র পাঠান। পত্রে তিনি লিখেনঃ ''আপনাকে আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।'' খলীফা উমারের এ পত্রখানি হাতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেনঃ 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান। তারপর তিনি লিখলেনঃ ''আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার

প্রয়োজনটা বুঝেছি। আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে *মুসিবাত আপতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে বাঁচানোর প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাইনা, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দান করুন।''

হযরত উমার এ পত্রখানি পাঠ করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এ কান্না দেখে তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলঃ 'আমীরুল মু'মিনীন, আবু উবাইদা কি ইনতিকাল করেছেন?' তিনি বলেছিলেনঃ 'না। তবে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।'

হযরত উমারের ধারণা মিথ্যা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তিনি বলেনঃ ''তোমাদেরকে যে উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের পথেই থাকবে। তোমরা নামায কায়েম করবে, রমাদান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দান করবে, হজ্জ ও উমরা আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং দুনিয়ার সুখ সম্পদে গা ভাসিয়ে দেবে না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও জীবন লাভ করে, আজ আমার পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও এই একই পরিণতি হবে।'' সকলকে সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর মুয়াজ ইবন জাবালের দিকে তাকিয়ে বলেনঃ 'মুয়াজ! *তুমি নামাযের ইমামতি কর।' এর পরপরই তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয়। মুয়াজ উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ্য করে বলেনঃ লোক সকল! তোমরা এ ব্যক্তির তিরোধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে জানিনা। তোমরা তাঁর প্রতি রহম কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের ঘটনা। এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে আবু উবাইদার মরদেহ বের করে আনলো। মুয়াজ

বিন জাবালের ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হল। মুয়াজ বিন জাবাল, আমর ইবনুল আস ও দাহ্*হাক বিন কায়েস কবরের মধ্যে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন। কবরে মাটিচাপা দেওয়ার পর মুয়াজ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর প্রশংসার করে বলেনঃ ''আবু উবাইদা, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। কারণ, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, বিনম্রভাবে যমীনের ওপর বিচর*ণকারী ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম যারা তাদের 'রবের' উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম-মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের শত্রুদেরই একজন।'

খাওফে খোদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, স্নেহ ও দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদিন একটি লোক আবু উবাইদার বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ করে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে লাগলেনঃ ''একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয় ও ধন-ঐশ্বর্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেনঃ 'আবু উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি তোমার সফরে সংগী হওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট মনে করবে। একটি তোমার, একটি তোমার খাদেমের এবং একটি তোমার জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য।' কিন্তু এখন দেখছি, আমার বাড়ী খাদেমে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। হায়, আমি কিভাবে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম). মুখ দেখাবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেছিলেনঃ সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।''

খলীফা হযরত উমার সিরিয়া সফরের সময় দেখতে পেলেন, অফিসারদের গায়ে

জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি এতই ক্ষেপে গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেনঃ তোমরা এত তাড়াতাড়ি অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো কিন্তু আবু উবাইদা একজন সাদামাটা আরব হিসেবে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গায়ে অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। খলীফা উমার রা. তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরো বেশী সরল- সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তাঁর বাড়ীতে আর কিছু নেই। খলীফা বললেনঃ আবু উবাইদা, আপনি তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।' জবাবে আবু উবাইদা বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। একবার হযরত উমার রা. উপঢৌকন হিসেবে চারশ' দীনার ও চার হাজার দিরহাম আবু উবাইদার নিকট পাঠালেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও রাখলেন না। হযরত 'উমার একথা শুনে মন্তব্য করেনঃ 'আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও আছে।' তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে পৃথক করা যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। একবার তো এক রোমান দূত এসে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'আপনাদের সেনাপতি কে'? সৈনিকরা যখন আঙ্গুল উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল, তখন তো সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

উৎস: আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬২৮

'হাশরের ময়দানে দেখা হবে'

Umar Faruq

Senior Member

০৯-১৭-২০১৫

'হাশরের ময়দানে দেখা হবে' বলে বাসর রাতে স্ত্রী থেকে বিদায় নেবার গল্প।

সাহাবাদের (রা) কাহিনী পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকি... কী ছিল তাদের ভালোবাসা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর ইসলামের জন্যে! আর কোথায় আমরা? নিজের শরীরটাকে দুঃখে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছা করে! ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের মত করে আত্মত্যাগ করার তওফিক দাও, আমীন!

সা'দ আল আসওয়াদ আস-সুলুমী (রা)-এর কথা কি আপনারা জানেন?

নামটাও হয়তো অনেকে শুনে নি কোনদিন। তাঁর সমাজে হাই-স্ট্যাটাস ছিল না, তিনি ছিলেন গরীব, গায়ের রঙ কালো। কেউ তাঁর কাছে নিজের মেয়েও বিয়ে দিতে চাইতো না।

সা'দ (রা) একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও কি জান্নাতে যাবো?"

"আমি তো নীচু মাপের ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হই" "কেউ আমাকে নিজের মেয়ে দিতে রাজি হয় না"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের দুঃখ বুঝতেন নিজের আপন ভাইয়ের মত করে, নিজের সন্তানের মত করে। তিনি তাদেরকে অনুভব করতেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তিনি এই সা'দকে পাঠিয়েছিলেন ইবন আল-ওয়াহহাবের কাছে। সাধারণ কোন ব্যক্তি ছিলেন না ইবন ওয়াহহাব। তিনি হলেন মদীনার নেতাদের একজন; কিছুদিন যাবৎ মুসলিম হয়েছেন। তাঁর মেয়ে অপরূপা

সুন্দরী রমণী, রূপের জন্য বিখ্যাত। সেই ইবন ওয়াহহাবের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দকে পাঠালেন।

নেতার মেয়ে বিয়ে করবে সা 'দের মতো একজনকে? যে তার সৌন্দর্য্যের জন্য এতো প্রসিদ্ধ, সে হবে সা'দের বউ?? স্বাভাবিকভাবেই ইবন ওয়াহহাবের প্রতিক্রিয়া ছিল "আকাশ-কুসুম কল্পনা ছেড়ে বাড়ি যাও"... কিন্তু তাঁর মেয়ে ততক্ষণে শুনে ফেলেছে। সে বলে উঠলো, "বাবা! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরোধ করেছে তাকে বিয়ে করার জন্যে, তুমি কিভাবে উনাকে ফিরিয়ে দিতে পারো?

রাসূলের উৎকণ্ঠা থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমাদের অবস্থানটা কি হবে?" এরপর সা'দের দিকে ফিরে বললো, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যেয়ে বলে দিন, আমি আপনাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত"

সা'দের মন সেদিন আনন্দে পুলকিত... সে যেন খুশিতে টগবগ করে ফুটছে...

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৪০০ দিনার মোহরানায় তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সুবহান আল্লাহ!

সা'দ বললেন, হে রাসূল, আমি তো জীবনে কোনদিন চারশ দিনার দেখিই নি! আমি এই টাকা কীভাবে শোধ করবো? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, আলী আল-নু'মান ইবন আউফ আর উসমান (রা) এর কাছ থেকে দুইশ দুইশ করে মোট চারশ দিনার নিয়ে নিতে। দুজনেই উনাকে দুইশর-ও বেশি করে দিনার দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! টাকার জোগাড় ও হয়ে গেলো। এখন নতুন বউ এর কাছে যাবেন সা'দ (রা)...

মার্কেটে যেয়ে সুন্দরী বউ এর জন্যে টুকিটাকি কিছু উপহার কেনার কথা চিন্তা করলেন তিনি। মার্কেটে পৌঁছে গেছেন, হঠাৎ তাঁর কানে আসলো জিহাদের ডাক। "যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও" ... সা'দ যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকালেন একবার, বললেন- "হে আল্লাহ! আমি এই টাকা দিয়ে এমনকিছু কিনবো যা তোমাকে খুশি করবে।" নতুন বউ এর জন্য গিফট কেনার বদলে তিনি কিনলেন একটি তরবারি আর একটি ঘোড়া। এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন জিহাদের ময়দানে, নিজের চেহারাটা কাপড় দিয়ে মুড়ে নিলেন,

যেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে চিনে ফেলতে না পারেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখলেই তো বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন! সে যে সদ্য-বিবাহিত! সাহাবারা (রা) বলাবলি করছিলেন, যুদ্ধ করতে আসা এই মুখ-ঢাকা লোকটি কে? আলী (রা) বললেন, "বাদ দাও, সে যুদ্ধ করতে এসেছে।" ক্ষিপ্ততার সাথে সা'দ যুদ্ধ করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ায় আঘাত হানা হলো, ঘোড়া পড়ে গেলো। সা'দ উঠে দাঁড়ালেন। ঐ সময় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কালো চামড়া দেখে ফেললেন, "ইয়া সা'দ এ কি তুমি?!" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশ্নের জবাবে তিনি (রা) বললেন "আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক ইয়া আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমি সা'দ"

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে সা'দ, জান্নাত ছাড়া তোমার জন্য আর কোন আবাস নেই।" সা'দ (রা) আবারো জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর কয়েকজন বললো সা'দ আহত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছুটে গেলেন ময়দানে। সা'দকে খুঁজতে লাগলেন। সা'দের মাথা খানা নিজের কোলের উপর রেখে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে সা'দের মুখের উপর এসে পড়ছিলো। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোখ বেয়ে নেমে আসছিলো অঝোর ধারা। একটু পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসতে শুরু করলেন, আর তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবু লুবাবা (রা) নামের একজন সাহাবা উনাকে দেখে বিস্ময়ে বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি আপনাকে এমনটি কখনো করতে দেখি নি"... আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি কাঁদছিলাম কারণ আমার প্রিয় সঙ্গী আজ চলে গেলো! আমি দেখেছি সে আমার জন্য কী ত্যাগ করলো আর সে আমাকে কতো ভালোবাসতো... কিন্তু এরপর আমি দেখতে পেলাম তার কী ভাগ্য, আল্লাহর কসম, সে ইতিমধ্যে হাউদে পৌঁছে গেছে।" আবু লুবাবা জিজ্ঞেস করলেন "হাউদ কি?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এটি হলো এমন এক ঝর্ণা যা থেকে কেউ একবার পান করলে জীবনে আর কোনদিন পিপাসার্ত হবে না, এর স্বাদ মধুর

চেয়েও মিষ্টি, এর রঙ দুধের চেয়েও সাদা! আর যখন আমি তাঁর এইরূপ মর্যাদা দেখলাম, আল্লাহর কসম, আমি হাসতে শুরু করলাম।"

"তারপর আমি দেখতে পেলাম সা'দের দিকে তাঁর জান্নাতের স্ত্রীগণ এমন উৎফুল্ল ভাবে ছুটে আসছে, যে তাদের পা গুলো বের হয়ে পড়ছে, তাই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।"

নবীজি অতঃপর সাহাবাদের কাছে এসে বললেন সা'দের ঘোড়া আর তরবারি নিয়ে আসতে, সেগুলো যেন সা'দের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে যেন বলা হয় এগুলো তার বংশধর। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে জানিয়ে দিও আল্লাহ তা'আলা সা'দকে জান্নাতে স্ত্রী দান করেছেন, তারা তার চাইতেও অনেক সুন্দর। এই হলো সা'দ, যিনি কিছুক্ষণ আগেও অনিশ্চিত ছিলেন যে সে জান্নাতে যেতে পারবে কী না। সমাজে তার কোন মর্যাদা ছিল না, কোন স্ট্যাটাস ছিল না, কিন্তু আল্লাহর চোখে এই হলো তাঁর স্ট্যাটাস। কারণ তাঁর জীবন এবং মরণ ছিলো শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে...।

''নিঃসন্দেহ আমার নামায ও আমার কুরবানি, আর আমার জীবন ও আমার মরণ - আল্লাহ্*র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক" [সূরাহ আন'আমঃ আয়াত ১৬২]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক সত্যনিষ্ঠ? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে। আর এটিই হচ্ছে মহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামফল্য। [সূরাহ আত-তাওবাঃ আয়াত ১১১]

সা'দের জীবনকাহিনী শুনে এ দু'টি আয়াতই মনে পড়ে যায়... আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কবুল করে নাও! আমীন...।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০৮

মোল্লা মুহাম্মদ উমার মুজাহীদের (রাহিমাহুল্লাহ) এর জীবনী

Umar Faruq

Senior Member

১০-১৯-২০১৫

মোল্লা মুহাম্মদ উমার মুজাহীদের (রাহিমাহুল্লাহ)এর জীবনী

৬ই এপ্রিল হচ্ছে মুসলমানদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক দিন। আজকের এই দিনে ১৯৯৬ সালে দেড় হাজার উলামা, মাশায়েখ ও জিহাদী নেতারা ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তানের প্রধান হিসেবে আমীরুল মুমিনীন উপাধি দিয়ে মোল্লা উমরের হাতে বাইয়াহ দেন।

জন্ম ও বংশঃ মোল্লা উমরের পিতার নাম হচ্ছে মৌলভি গোলাম নবী, দাদার নাম মুহাম্মদ রাসূল এবং প্রপিতামহের নাম বাজ মুহাম্মাদ। ১৯৬০ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের খাকরেজ জেলার জাহ হিমত গ্রামের এক দ্বীনদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মোল্লা উমরের পিতা গোলাম নবীও অত্র এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন, এই এলাকায়ই বিভিন্ন হালকায় দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। দ্বীনি শিক্ষাদান, ওয়াজ-নসিহতের কারণে লোকদের কাছে একজন আলেম ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মোল্লা উমরের জন্মের দু' বছর তাঁর পিতা কান্দাহার প্রদেশের খাকরেজ জেলা ত্যাগ করে অন্য জেলা ডাঁণ্ড জেলায় স্থানান্তর করেন, সেখানেই দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থাকাবস্থায় ১৯৬৫ সালে মোল্লা উমর পাঁচ বছরের শিশু থাকাবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

পিতার ইন্তেকালের পর মোল্লা উমরকে পরিবারের সাথে ডাঁণ্ড জেলা থেকে উরুজগান জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে চাচা মৌলভি মুহাম্মদ আনওয়ার ও মৌলভি মুহাম্মদ জুম'আর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করেন। শিক্ষা অর্জনঃ আট বছর বয়সে মোল্লা উমর উরুজগান জেলার একটি মাদ্রাসায়

আলাইহি ওয়া সাল্লামর ভর্তি হন। মাদ্রাসায় আলাইহি ওয়া সাল্লামর প্রধান উনার চাচা মৌলভি মুহাম্মদ জুম'আ ছিলেন। চাচাদ্বয়ের তত্ত্বাবধানেই ওই মাদ্রাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ইলম অর্জন করেন। এরপর আঠার বছরে বয়েসে আফগানিস্তানের প্রচলিত উচ্চ শিক্ষাঅর্জন শুরু করেন, এমতাবস্থায় কম্যুনিস্টরা আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করে। তাই তাঁর উচ্চ শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। বংশঃ গোত্রীয় দিক দিয়ে মোল্লা উমর পাখতুনের হুতকের শাখা তুমযাঈ থেকে ছিলেন। ১৮৮০ সালে ইরানি সফবি জাসালিমদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা দ্বীনদার, বিচক্ষণ সর্বজন গ্রহণযোগ্য মুজাহিদ বিজয়ী হাজী মীরওয়েস এই গোত্রের ছিলেন।

মোল্লা উমরের পরিবার সর্বদা ইলম, দ্বীনদারি ও মাদ্রাসার শিক্ষকতা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। দ্বীনদারি এবং সামাজিকতার দরুন সাধারণ জনগণের কাছে এ পরিবার গ্রহণযোগ্য ছিলো।

জিহাদী এবং সংগ্রামী জীবনঃ

মোল্লা উমর এখনো বয়েসের দিক দিয়ে তৃতীয় দশকে পা রাখেন নি যে, আফগানিস্তানে কম্যুনিষ্টরা আধিপত্য বিস্তার করলো। তখন তিনি শিক্ষার্জন অসমাপ্ত রেখেই উরুজগানে হরকাতে ইনকিলাবে ইসলামির অধীনে জিহাদ শুরু করেন। অল্প দিনে বীরত্ব ও সাহসিকতায় সবার বিশ্বাস অর্জন করেন যে, যখন দেওহরাউদ জেলায় বিভিন্ন এলাকার মুজাহিদরা বিশাল লক্ষ্য নিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলেন, তখন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত মুজাহিদরা মোল্লা উমরকে গ্রুপ প্রধান নির্বাচন করেন। তিনি এই অপরেশনও অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। এই যুদ্ধেই তিনি প্রথমবারের মতো আহত হন। তিনি ধারাবাহিক তিন বছর নিজের এলাকার মুজাহিদদের সাথে রুশ ও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর তিনি ১৯৮৩ সালে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির প্রসিদ্ধ কমাণ্ডার ফয়জুল্লাহের অধীনে কান্দাহার জেলার মেওয়ান্দে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। দিনে দিনে তার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে থাকে। অবশেষে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির প্রধান মৌলভি মুহাম্মদ নবী মুহাম্মদীর নেতৃত্বে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামীর পক্ষ থেকে একটি পৃথক স্বতন্ত্র গ্রুপের কমান্ডার নির্বাচিত হন।

এরপর মোল্লা উমর ১৯৮৩-১৯৯১ সাল পর্যন্ত কান্দাহারের যাড়ি, মেওয়ান্দ, ইয়ানজুয়ায়ি এবং ডাঁণ্ড সোভিয়েতের শক্তিশালী ঘাঁটি সমূহে হামলা শুরু করেন, প্রায় প্রতিদিন হামলা পরিচালনা করতেন। এমনিভাবে জাবুল প্রদেশের সাফা ও মারকায কিলাত জেলার কাবুল-কান্দাহারের প্রধান সড়কে উল্লেখযোগ্য অপারেশন পরিচালনা করেন। মোল্লা উমরের প্রিয় অস্ত্র আরপিজি ছিলো, যা তিনি রাশিয়ান ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। রকেট চালানোর ক্ষেত্রে খুব দক্ষতা ছিলো। রাশিয়ানদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে কান্দাহারের এসব অপারেশন খুব গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখে। এই সড়কে এই পরিমাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় যে, হেরাতের রাস্তার দুপাশের ট্যাঙ্ক ও শত্রুদের গাড়ীর দেওয়াল নির্মাণ হয়ে যায়। রাশিয়াবিরোধী জিহাদি মোল্লা উমর চারবার আহত হন, এমনকি শেষের বার তাঁর ডান চক্ষু হারিয়ে ফেলেন।মোল্লা উমর কান্দাহার এবং এর আশপাশের প্রদেশসমূহে একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার ছিলেন, যিনি অনেক জিহাদি অপারেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

এখানে চারটি অপারেশনের বর্ণনা দেওয়া আছে যা তার সাথীদের মুখ থেকে শোনা গেছে।

(উর্দুতে পাবেন, লম্বা হয়ে যাবে তাই অনুবাদ করি নি)

১৯৯২ সালে ডক্টর নজিবের পতনের পর জিহাদীগ্রুপের দাঙ্গার প্রারম্ভে মোল্লা উমর তার কিছু বিশ্বস্ত সাথীদের সাথে নিজ অস্ত্র রেখে নিজের জিহাদি অঞ্চল কান্দাহার প্রদেশের মেওয়ান্দ জেলার সঙ্গ সাল্লামরের একটি গ্রামে হাজী ইব্রাহীম মসজিদের পাশে একটি দ্বীনি মাদ্রাসায় আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই মাদ্রাসায় আলাইহি ওয়া সাল্লাময় থাকা শুরু করেন।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর জিহাদের পর নিজের কিছু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথীদের সাথে অসম্পূর্ণ ইলম অর্জনে ব্রতী হলেন।বিশৃংখলা, অশান্তি ও গৃহযুদ্ধ পরবর্তী ইমারাতে ইসলামিয়্যাহের প্রতিষ্ঠাঃ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সারাদেশে যখন অশান্তি বিরাজ করছিলো, একের পর এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিলো। মোল্লা উমর তখন আপন মুজাহিদ সাথীদের সাথে কান্দাহারের মেওয়ান্দ জেলায় ছিলেন। সারাদেশের অনিশ্চিত অবস্থা তাকে ভাবিয়ে তুলল। সব খবরাখবর নিয়মিত রাখছেন।

এই অরাজকতার অবসানকল্পে মোল্লা উমর ও সাথীরা মিলে প্রসিদ্ধ উলামা-মাশায়েখেদেরকে নিয়ে কান্দাহারের ইয়ানজুয়ায়ী জেলার যাঙ্গাওয়াত এলাকায় একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদের যুগে মুজাহিদদের প্রধান বিচারপতি মৌলভি সায়্যিদ মুহাম্মদ সাহেব (যিনি মৌলভি ইয়াসিনি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন) মোল্লা উমরকে বলেন তুমি এই অরাজকতার বিরুদ্ধে ওঠো, আমরা তোমাকে সাহায্য করবো। এই বৈঠকেই মোল্লা উমর ইসলামি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং ১৫মুহাররম ১৪১৫ হিজরিতে জালুম ও ফাসাদ আলাইহি ওয়া সাল্লামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভিত্তি রাখেন।

কান্দাহার থেকে শুরু হওয়া এই বিপ্লব ক্রমান্বয়ে সারা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে, যখন ইমারাতের মুজাহিদরা একসময় অর্ধেকের বেশি আফগানিস্তান দখল করে নেন তখন ১৪১৬ হিজরি ১৫ যীকাদায় কান্দাহারের ১৫০০ উলামার একটি বৈঠক সম্পন্ন হয়। সেই বৈঠকেই উলামারা ইমারাতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে মোল্লা উমরকে আমীরুল মুমিনীন উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। এভাবে ১৯২৪ সালে খিলাফাতে উসমানিয়্যাহের পতনের ৭২ বছর পর সালে একটি শরীয়াহ পরিচালিত ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। এর কিছুদিন পর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল মুজাহিদদের হস্তগত হয়। এভাবে আফগানিস্তানের ৯৫ ভাগ এলাকা মুজাহিদদের করতলগত হয়।

মোল্লা উমরকে যখন এইসব উলামাদের উপস্থিতিতে আমীরুল মুমিনীন উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হলো তখন খুশীতে আত্মহারা হন নি। বরং তিনি বলেন, ‘হে উলামারা! আজ আপনারা শরয়ী ইলমের ভিত্তিতে নবীগণের উত্তারাধিকার হিসেবে যে দায়িত্ব আজ আমার কাঁধে অর্পন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এর দৃঢ়তা অথবা স্খলনের পূর্ণ জিম্মাদার আপনারা সবাই।

আমাদের উস্তাদবৃন্দ এবং সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! আল্লাহ না করুন, যদি আমাদের থেকে মুসলমানদের এই আমানতের মধ্যে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি হয়ে যায়, তাহলে এর সংশোধন এবং ইসলাহ করা আপনাদের শরয়ী দায়িত্ব। আপনারা নিজেদের শরয়ী ইলমের আলোতেই তালেবান মুজাহিদদের অবিচলতা এবং তাদের সত্য রাস্তার উপর চলার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিবেন। যদি তালেবানের পক্ষ থেকে ইসলামি আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি হয়ে যায়, এবং

আপনারা তা দেখেন, এবং ইসলাহের জন্যে কিছু না বলেন, তাহলে আল্লাহর কাছে এর দায়িত্ব আপনাদের উপর এবং আমি প্রশ্ন-উত্তরের দিন আপনাদের গর্দান আকড়ে ধরবো'।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মোল্লা উমরের ব্যক্তিত্বঃ

মোল্লা উমর নেতৃত্বের পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, সাধাসিধে জীবনের অধিকারী, পৃথিবীর অন্যান্য শাসকের মতো বিলাসী নন। অনর্থক কথা বলেন না, কিন্তু প্রয়োজনের সময় তার কথা পূর্ণ দৃঢ়তা, বুঝেসুঝে এবং যৌক্তিক হয়। উদাহরণ স্বরূপ আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলার পূর্বে আমেরিকা মুজাহিদদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানো শুরু করে। কিন্তু মোল্লা উমর এই তামাম শয়তানী মিডিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ণ দৃঢ়তা, প্রশান্তি, পূর্ণ নির্ভরতা ও প্রত্যয়ের সাথে সহজ সরল ভাষায় অর্থপূর্ণ কয়েকটি বাক্য দ্বারা নিজের গোত্রকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্তনা দিলেন। তিনি বলেন,'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ তাআলার জন্যে আমেরিকা এবং পিপিলিকা বরাবর। আমেরিকা এবং তাদের জোটবাহিনীকে এটা জেনে রাখা উচিৎ, যে, ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ এমন কোনো শাসন ব্যবস্থা নয় যে, এর আমীর জহির শাহের (আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ) মতো রূমে চলে যাবে এবং সৈন্যরা তোমাদের সম্মুখে অস্ত্র ফেলে দেবে। বরং এটা হচ্ছে জিহাদের উপর একটি সুশৃংখল ঘাঁটি।

যদি তোমরা শহরসমূহ এবং রাজধানীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে নাও, ইসলামি হুকুমতকে পতনও করে ফেলো, তাহলে আমাদের মুজাহিদরা গ্রাম এবং পাহাড়ে চলে যাবে।তখন তোমরা কী করবে? অতঃপর তোমরা কম্যুনিস্টদের মতো প্রত্যেক স্থানে মারা যাবে। তোমরা জেনে রাখো যে, বিশৃংখলা এবং যুদ্ধ সৃষ্টি করা সহজ, কিন্তু বিশৃংখলা এবং যুদ্ধের সমাপ্তি করা অনেক কঠিন। মৃত্যু সত্য এবং কাছে আসবে, আমেরিকার সাহায্য করে বেঈমানি এবং লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যু আসা ভালো না ইসলামের অবস্থায় ঈমানের সাথে সম্মানিত অবস্থায় মৃত্যু আসা উত্তম'? ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বাস্তবতা আপনার সামনে।এমনিভাবে তিনি আমেরিকান হামলার শুরুতে একটি রেডিও বার্তায় বলেন, 'অস্ত্র মৃত্যু দিতে পারে, কিন্তু মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না'।

তাঁর দৃষ্টিতে বেশি বলার চেয়ে কাজ বেশি প্রিয়। তাঁর জীবন লৌকিকতা থেকে পবিত্র। তার এই সাধাসিধে জীবন সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। সাধারণ পোষাক, সাধারণ খাদ্য, লৌকিকতামুক্ত কথা, সাধারণ উঠাবসা তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। লৌকিকতাপূর্ণ চালচলন তাঁর মোটেও পছন্দ নয়। আলেম-উলামাদের সম্মান করেন।এসব কারণেই তার অধীনস্থ মুজাহিদরা তাঁকে খুব ভালোবাসেন।

মুসলিম উম্মাহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে গুরুত্বারূপঃ

মুসলমানদের একজন নেতা হিসেবে সমগ্র মুসলিমবিশ্বের খবরাখবর বিশেষভাবে রাখতেন। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দস এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ব্যাপারে বিশ্বের সমগ্র মুসলিমদেশের শাসকদের অবস্থানের বিরোধিতা করতেন। তিনি দখলদার জায়নবাদিদের হাত থেকে মসজিদে আকসাকে মুক্ত করা প্রত্যেক মুসলমানদের শরয়ী দায়িত্ব মনে করতেন।মোল্লা উমর একজন দরদী নেতা, মুসলমান ভাইদের সাথে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা এগুলো তার দাবি নয়, বরং সর্বদা তাদেরকে তাঁর অবস্থান কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

আকীদা ও মতাদর্শঃ

মোল্লা উমর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মানহাজে হানাফি মাযহাবের অনুসারি। বেদায়াত-কুসংস্কারের কট্টরবিরোধী। মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবি এবং সাংগঠনিক বাড়াবাড়ি তার মোটেও পছন্দ নয়। নিজে মুজাহিদ ও সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাগত ও ইসলামি ঐক্যের বার বার গুরুত্বারূপ করেন। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে সালাফে সালেহীন ও আইয়াম্মায়ে মুজতাহিদের উপর চলাকে মুসলিম উম্মাহের এক মাত্র মুক্তির উপায় মনে করেন।

ব্যক্তি জীবনে মোল্লা উমরঃ

মোল্লা উমরের জীবনের অধিকাংশ অংশ দ্বীনি জ্ঞানার্জন, মুতালাআহ, জিহাদ, দাওয়াত এবং ইসলামি খিদমতে অতিবাহিত হয়েছে। আফগানিস্তানের সমকালীন শাসকবর্গের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে দরিদ্র এবং বায়তুল মালকে ব্যবহার না করা কারী ব্যক্তি তিনিই হবেন। কেননা না তিনি অতীতের জিহাদের সময় নিজের জিহাদি প্রভাব ও অবস্থানকে কর্ম হিসেবে ধরে নিজের ব্যক্তি জীবনের স্বার্থে কিছু

অর্জন করেছেন, এবং না ইমারাতে ইসলামিয়্যাহের ৭ বছরের শাসনে এ ধরনের কিছু করেছেন।

মোল্লা মুহাম্মদ উমর কোনো ঘরের স্বত্ত্বাধিকারী নন, এবং না বহির্দেশীয় ব্যাংকে তার কোনো অর্থ আছে।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের উপর এক তরফা জুলুমবাজি অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং বহির্বিশ্বে তালেবান নেতাদের গচ্ছিত অর্থসমূহের উপর নজরদারি শুরু হয়ে যায়। মোল্লা উমর ইমারাতে ইসলামিয়্যাহের আমীর হিসেবে সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন, তার ব্যক্তিগত অথবা প্রয়োজনের নামে আফগানিস্তানের বাহির বা ভেতরে কোনো ব্যাংকে একাউন্ট ছিলো না।

ইমারাতে ইসলামিয়্যাহর শাসনকালে তার বসবাসের ঘর শত্রুদের পক্ষ থেকে ভয়ানক হামলার লক্ষ্যবস্তু বনে যায়। যার কারণে তার বংশের নিকটাত্মীয়সহ অনেকেই শহীদ হন। এজন্যে ইমারাতে ইসলামিয়্যাহের কিছু নেতাদের সিদ্ধান্তে তাঁর হেফাজতের জন্যে কান্দাহার শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'বাবা সাহেব কুতেল'র এলাকায় যেথায় নিকটে কোনো সাধারণ বসতি ছিল না, তার জন্যে একটি বসবাসের ঘর এবং ইমারাতে ইসলামিয়্যাহের কেন্দ্রীয় আমীরের অফিস বানানো হয়। যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বায়তুল মালের সাধারণ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হতো, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নয়।

স্বভাব ও ব্যবহারঃ

মোল্লা উমর নিজের মিতভাষিতার সাথে সাথে এক বিশেষ ধরনের বৈচিত্র্য ও হর্ষপ্রকৃতির স্বভাব রাখতেন। তিনি কোনো ব্যক্তিকে চাহে সে উনার থেকে বয়সে কতই কম হোক নিজেকে তার থেকে বড় মনে করতেন না। নিজের সাথীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অশেষ প্রীতিপূর্ণ, আন্তরিক, সৌহার্দপূর্ণ, ভালবাসা এবং পারস্পারিক সম্মানের ভিত্তিতেই হয়। মজলিসসমূহে জিহাদের সূত্রে অধিকাংশ কথাবার্তা ও আলোচনা করতেন।

আল্লাহ তা'আলা এই প্রিয়নেতাকে জান্নাতের জন্যে কবুল করুন!! আমীন!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯০৮

আমরা যাদের উত্তরসূরি

Umar Faruq

Senior Member

১০-২৬-২০১৫

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেছেনঃ ‘লিকুল্লি উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া আমীনু হাজিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা- প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।’ তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও দীর্ঘদেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালোবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের ন্যায়। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর ‘আমীন’- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর পুরো নাম আমীল ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল –ফিহরী আল কুরাইশী। তবে কেবল আবু উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম উর্ধ পুরুষ ‘ফিহরের’ মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মাও ফিহরী খান্দানের কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারের রা. মন্তব্য হলঃ ‘কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন- আবু বকর সিদ্দিক, উসমান ইবন আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।’

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন আবু উবাইদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত আবু বকরের মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন মাজউন, আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম ও তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. দরবারে হাজির হন। সেখানে যারা সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামী ইমারতের প্রথম ভিত্তি। মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদা শরীক চিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাতের পর তিনিও মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় সা'দ বিন মুয়াজের সাথে তাঁর 'দ্বীনী মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার উর্ধে। যুদ্ধের ময়দানে এমন বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশরিকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিকবিদিক পালাতে থাকে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর তিনিও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও আবু উবাইদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃতপক্ষে আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা আবু উবাইদা ও তাঁর পিতার শানে নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল করেন। 'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বিরুদ্ধাচরণ করেছে- তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' (আল মুজাদিলা- ২২)

আবু উবাইদার এরূপ আচরণে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও ঈর্ষা পোষণ করতেন। মুহাম্মাদ ইবন জাফর বলেনঃ 'খৃস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) দরবারে হাজির হয়ে বললো- হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার মনোনীত কোন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বললেনঃ 'সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।' হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব বলেনঃ 'আমি সেদিন সকাল সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মত আর কোন দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. এ প্রশংসার পাত্রটি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আমাদের সাথে জোহরের নামায শেষ করে ডানে বায়ে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেনঃ 'তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত

বিষয়টির ফায়সালা করে দাও।' আমি তখন মনে মনে বললামঃ আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

আবু উবাইদা কেবল একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূত করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বদর যুদ্ধের প্রাক্*কালে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. একদল সাহাবীকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। পাথেয় হিসাবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন আবু উবাইদা তাঁর প্রত্যেক সংগীকে মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁর শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ অষ্টম হিজরীতে রজব মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আবু উবাইদার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া তাঁদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর। এই একটি খেজুর খেয়েই তাঁর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ কোথায়, মুহাম্মাদ কোথায়....'। তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গণ্ডদেশে বর্মের দুটি বেড়ী বিঁধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক বেড়ী দু'টিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। আবু উবাইদা তাঁকে বললেন, 'কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।' তিনি

ছেড়ে দিলেন। আবু উবাইদা ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ী দু'টি তুললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. হয়ত কষ্ট পাবেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন আবু বকর রা. মন্তব্য করলেনঃ 'আবু উবাইদা সর্বোত্তম ব্যক্তি।' খন্দক ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন। খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'জাতুস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাসিল' অভিযানে হযরত আমর ইবনুল আসের বাহিনীর সাহায্যের জন্য দু'শ' সিপাহীসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আবু উবাইদাকে পিছনে পাঠান। তাঁরা জয়লাভ করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. সফরসংগী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেনঃ 'ওহে আনসারদের সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়োনা।' এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করি। আমি রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলতে শুনেছিঃ 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' এর জবাবে আবু উবাইদা বললেনঃ 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারিনা যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।' একথার পর আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা হল। আবু বকরের খলীফা হবার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন ।আবু বকরের পর হযরত উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন।

হযরত আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবু উবাইদাকে হিমস, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে দিমাশ্*ক, শুরাহবীলকে জর্দান এবং 'আমর ইবনুল আসকে ফিলিস্তীনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন আবু উবাইদাকে। দিমাশ্*ক, হিমস, লাজেকিয়া প্রভৃতি শহর বিজিত হয় আবু উবাইদার হাতে। ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। 'আমর ইবনুল 'আসের আহ্*বানে সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা খোদ খলীফা 'উমারের সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে আবু উবাইদাই সে কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 'জাবিয়া' পৌঁছলে আবু উবাইদাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশ্*কের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে খলীফা উমার আবু উবাইদাকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 'তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমীনুল উম্মাত তোমাদের ওয়ালী।'

আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়। খলীফা হযরত উমার রা. নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাজধানী মদীনা থেকে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আবু উবাইদা সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের পক্ষে মত দিলেন। হযরত উমার সবাইকে আহ্*বান জানালেন তাঁর সাথে আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা বেঁকে বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আ ফিরারুম মিন কাদলিল্লাহ- একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন নয়?' খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেনঃ 'আফসুস! আপনি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। আবু উবাইদা তাঁর বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার মদীনা পৌঁছে দূত মারফত আবু উবাইদাকে একখানা পত্র পাঠান। পত্রে তিনি লিখেনঃ ''আপনাকে

আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।'' খলীফা উমারের এ পত্রখানি হাতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেনঃ 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান। তারপর তিনি লিখলেনঃ ''আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝেছি। আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে *মুসিবাত আপতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে বাঁচানোর প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাইনা, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দান করুন।''

হযরত উমার এ পত্রখানি পাঠ করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এ কান্না দেখে তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলঃ 'আমীরুল মু'মিনীন, আবু উবাইদা কি ইনতিকাল করেছেন?' তিনি বলেছিলেনঃ 'না। তবে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।'

হযরত উমারের ধারণা মিথ্যা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তিনি বলেনঃ ''তোমাদেরকে যে উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের পথেই থাকবে। তোমরা নামায কায়েম করবে, রমাদান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দান করবে, হজ্জ ও উমরা আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং দুনিয়ার সুখ সম্পদে গা ভাসিয়ে দেবে না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও জীবন লাভ করে, আজ আমার পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও এই একই পরিণতি হবে।'' সকলকে সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর মুয়াজ ইবন জাবালের দিকে তাকিয়ে বলেনঃ 'মুয়াজ! *তুমি নামাযের ইমামতি কর।' এর পরপরই তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয়।

মুয়াজ উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ্য করে বলেনঃ লোক সকল! তোমরা এ ব্যক্তির তিরোধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে জানিনা। তোমরা তাঁর প্রতি রহম কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের ঘটনা।

এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে আবু উবাইদার মরদেহ বের করে আনলো। মুয়াজ বিন জাবালের ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হল। মুয়াজ বিন জাবাল, আমর ইবনুল আস ও দাহ্*হাক বিন কায়েস কবরের মধ্যে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন। কবরে মাটিচাপা দেওয়ার পর মুয়াজ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর প্রশংসার করে বলেনঃ ''আবু উবাইদা, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। কারণ, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, বিনম্রভাবে যমীনের ওপর বিচর*ণকারী ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম যারা তাদের 'রবের' উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম-মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের শত্রুদেরই একজন।'খাওফে খোদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, স্নেহ ও দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদিন একটি লোক আবু উবাইদার বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ করে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে লাগলেনঃ ''একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয় ও ধন-ঐশ্বর্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেনঃ 'আবু উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি তোমার সফরে সংগী হওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট মনে করবে। একটি তোমার, একটি তোমার খাদেমের এবং

একটি তোমার জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য।' কিন্তু এখন দেখছি, আমার বাড়ী খাদেমে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। হায়, আমি কিভাবে রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. মুখ দেখাবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেছিলেনঃ সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।'' খলীফা হযরত উমার সিরিয়া সফরের সময় দেখতে পেলেন, অফিসারদের গায়ে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি এতই ক্ষেপে গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেনঃ তোমরা এত তাড়াতাড়ি অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো কিন্তু আবু উবাইদা একজন সাদামাটা আরব হিসেবে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গায়ে অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। খলীফা উমার রা. তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরো বেশী সরল- সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তাঁর বাড়ীতে আর কিছু নেই। খলীফা বললেনঃ আবু উবাইদা, আপনি তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।' জবাবে আবু উবাইদা বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। একবার হযরত উমার রা. উপঢৌকন হিসেবে চারশ' দীনার ও চার হাজার দিরহাম আবু উবাইদার নিকট পাঠালেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও রাখলেন না। হযরত 'উমার একথা শুনে মন্তব্য করেনঃ 'আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও আছে।'

তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে পৃথক করা যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। একবার তো এক রোমান দূত এসে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'আপনাদের সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙ্গুল উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল, তখন তো সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৭৬

আগুন

শুহাদার কানন

Junior Member

১২-১১-২০১৫

বিসমিল্লাহ আর-রাহমান আর-রাহীম

শাইখ সাথে পা ভাজ করে বসলেন। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে আমামাহ ঠিক করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চারপাশে বসে থাকা ছাত্রদের দিকে এক একে তাকালেন। তাঁরা বসে ছিল স্থির হয়ে, নিবিষ্ট মনে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে – যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে, আর একটু নড়াচড়াতেই উড়ে যাবে। শাইখ শুরু করলেনঃ

."হে বৎস, কাল আমরা কিতাবের কোথায় শেষ করেছিলাম?"

"আমরা লেখকের এই বক্তব্য পর্যন্ত পৌছেছিলাম – " জামা'আ হল তাই যা হাক্কের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামমঞ্জস্যপূর্ণ। যদি শুধু একজন সম্পূর্ণ সত্যকে স্বীকার করে, তবে সেটাই জামা'আ, যদি তাতে একজন থাকে, তাও।""

"হ্যা, হ্যা। আর আমি তোমাদের বলেছিলাম যে হাক্ক হল তা-ই যার উপর আমাদের এই জামা'আ আছে। আর যে আমাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে দ্বিমত করবে, সে জামা'আ ত্যাগ করবে। এবং সে তাঁর এই কাজের মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে বিদ'আ করেছে এবং মুমিনদের রাস্তার বিপরীত পথে চলে গেছে, এবং..."

.হঠাৎ ভেসে আসা দরজায় আঘাতের শব্দে শাইখের কথায় বাঁধা পড়লো...

শাইখ কথা থামিয়ে একজন ছাত্রের দিকে তাকালেন। তৎক্ষণাৎ ছাত্রটি উঠে গিয়ে দরজা খুললো...

দরজার ওপাড়ে দাড়ানো উস্কখুস্ক চুলের, কালি মাখা মুখের লোকটি চেঁচাতে শুরু করলোঃ

"ইয়া শাইখ ! ইয়া শাইখ ! আদিলের ঘরে আগুন লেগেছে, সব পুড়ে যাচ্ছে..."

.শাইখ জায়গায় বসে মাথা ঘুড়িয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেনঃ

“আর তাতে আমার কি?”

“আমাদের এই মুহূর্তে আপনার এবং আপনার ছাত্রদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাহায্য বড়ই প্রয়োজন হে শাইখ...”

“তুমি চাও আদিলের অসতর্কতার কারণে,সে যে সমস্যায় পতিত হয়েছে, আমি সেটার সমাধান করি?”

“শাইখ, বাসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভর্তি নারী আর শিশু, এরা সবাই মারা পড়বে!”
.“এসবই আদিলের কর্মফল। সে নিজেই এই বিপদ ডেকে এনেছে”

এটুকু বলেই শাইখ তাঁর ছাত্রের প্রতি ইশারা করলেন। উস্কখুস্ক চুলের কালিমাখা লোকটির মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শাইখ আবার তাঁর দারস শুরু করলেনঃ
“ হে আমার সন্তানেরা, যেনে রাখো, যারাই আমাদের জামা’আর বিরুদ্ধে কথা বলে তারা গোমরাহ, বিদ’আতি এবং মন্দের অনুসরণকারী”

একজন ছাত্র প্রশ্ন করলোঃ

“যদি তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাও?”

“কিভাবে তারা আহলুস সুন্নাহ-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না? কেউ আমাদের জামা’আর বিরোধিতা করার পরও কিভাবে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বরং সে একজন বিদ’আতি। না, বরং সে আহলুল বিদ’আর চাইতেও নিকৃষ্ট, কারণ সে এমন সব ব্যক্তিদের তাবলিস করে যাদের বেশীরভাগ...”
দরজায় করাঘাতের শব্দে আবারো শাইখের কথায় ছেদ পড়লো। একজন ছাত্র উঠে গিয়ে দরজা খুললো। চৌকাঠের ওপাড় থেকে সেই একই উস্কখুস্ক চুলের, কালিমাখা মুখের লোক আর্তনাদ করে উঠলোঃ

“ইয়া শাইখ, আগুন সালিহ-র ঘর পর্যন্ত পৌছে গেছে...”

“কোন সালিহ? বিদ’আতি সালিহ?”

“হে শাইখ, যারা তাঁর ঘরে আটকা পড়েছে তাঁদের আগুনের হাত থেকে বাঁচান, তারপর তাঁকে নাসীহাহ করুন।“

শাইখ বললেনঃ “এই হল আল্লাহ-র পক্ষে থেকে ত্বরিত শাস্তি সেই ব্যক্তির জন্য যে বিদ’আ করেছে”

তিনি তাঁর ছাত্রের দিকে দরজা বন্ধ করার ইশারা করলেন। শাইখ আবার শুরু করলেনঃ

“দেখ কিভাবে আল্লাহ্* এই বিদ’আতি খবিশকে শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্* এই ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছে কারণ সে আহলুস সুন্নাহর পোষাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখন সে আমাদের বরকতময় জামা’আর বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করলো, তখন আল্লাহ্* তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন। এবং তিনি সুবহানাহু তা’আলা এই বিদ’আতির শাস্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, আর তাই এখন তার ঘর আগুনে পুড়ছে।“

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে একজন ছাত্র বললোঃ

“কিন্তু শাইখ...আমি সালিহকে চিনি...আর আমি তো তাঁর মধ্যে কোন বিদ’আ দেখি নি!”

“হাহ! তুমি দেখো নি কারণ তুমি আল জারহ ওয়াল তা’দীল সম্পর্কে এখনো সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারো নি। আর তাই আমি তোমাকে বলছিঃ যে ব্যক্তি সুন্নাহরা আড়ালে লুকিয়ে থাকে সে প্রকাশ্য বিদ’আতির চাইতে বেশি ভয়ঙ্কর। এই যে সালিহ, আমি তাকে বহুবার মাসজিদে দেখেছি। সে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, আমার দিকে তাকায় পর্যন্ত না ! এবং সে আমাকে এড়িয়ে চলে।“

“শাইখ এটা কি একটা বিদ’আ?”

“অবশ্যই। যদি সে আমাদের বরকতময় জামা’র সদস্য হত, তবে অবশ্যই সে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতো!”

তৃতীয়বারের মত শাইখের কথায় বাধা পড়লো। দরজা খোলা মাত্র উস্কখুস্ক চুলে, কালিমাখা চেহারার লোকটি কান্না মিশ্রিত গলায় চিৎকার করে বললোঃ "ইয়া শাইখ, আগুন মাসজিদ পর্যন্ত পৌছে গেছে..."

শাইখ তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে লোকটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেনঃ

" আমি ভেবেছিলাম এরকমটা ঘটবে। কারণ এই মাসজিদ বিদ'আতিদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর বিদ'আতিরা এই মাসজিদে প্রবেশ করেছে, সালাত আদায় করেছে এবং তাদের বিদ'আ ছড়িয়েছে। হে ব্যক্তি! তুমি আমাদের যথেষ্ট বিরক্ত করেছো। আর এখানে আসবে না।"

"ইয়া শাইখ।...মাসজিদ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে!"

"হোক মাসজিদ...এসব কিছুর কারণ হল আদিল। সেই এসবের জন্য দায়ী"

তিনি ইশারায় তাঁর ছাত্রদের দরজা বন্ধ করতে বললেন।

"দেখো, আহলুল বিদ'আর গুনাহর ফলাফল। লা হাওলা ওয়ালা কু'আতা ইল্লাহ বিল্লাহ...এমনকি মাসজিদও তাঁদের বিদ'আর অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেলো না।"

"হে শাইখ, আমাদের কি মাসজিদের আগুন নেভাতে তাঁদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাহায্য করা উচিৎ না?"

শাইখ গলা পরিষ্কার করলেন...

"হে বৎস...যারা আগুন নেভানোর কাজ করছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লোক আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ'আতি, কেউ কেউ ফুসসাক ...আর আমাদের জামা'আ এসব থেকে মুক্ত। যদি আমরা তাদের সাহায্য করতে যাই, তবে আমাদের মধ্যে তাদের অকল্যাণ প্রবেশ করবে।"

তিনি একজন ছাত্রের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেনঃ

"তুমি পড়া শুরু করো, বারাকাল্লাহু ফীক"

কিন্তু ছাত্রটি কিতাব থেকে পড়া শুরু করার আগেই , একটি বিকট শব্দ তাদের হতচকিত করে দিলো।

শাইখসহ তারা সকলে দরজার দিকে ছুটে গেলেন

কিন্তু দরজাটা কোন ক্রমেই খুলছিল না। আর তখনই তাদের চোখের সামনে তাদের ঘরের দেয়াল ধ্বসে পড়তে শুরু করলো...

আর চারদিক থেকে আগুন তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।"

***

.-লিখিত- ২-ই জিলক্বদা, ১৪২২ হিজরি

আল্লামা শাইখ নাসির বিন হামাদ আল-ফাহদ

আল্লাহ্* যেন মুরতাদ আল-সাউদের কারাগার থেকে তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করেন।

আল্লাহ্* যেন মুসলিম উম্মাহকে ত্যাগকারী শাসকদের, ইবাদাতকারী 'আলেমদের বিচারের দিনে এইসব শাসকদের সাথেই একত্রিত করেন। আল্লাহ্* যেন বিদ'আ, ইরজা ও গুলুহ থেকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আকে রক্ষা করেন।

link>
https://www.youtube.com/watch?v=exdHNElG8gQ

এভাবে শাইখ নাসিরকে নির্যাতন করা হয়। ইনি হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি হাদীসের নয়টি কিতাব [৯টি খন্ড না] মুখস্থ করেছেন।

আল্লাহু মুস্তা'আন

https://twitter.com/ahmadmusajibril/...৬২২৩৩৮৬৮১৬৯২১৭

সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮০

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

Ahmad Faruq M

Senior Member

১২-২১-২০১৫

==========

মুসলিম জাতিকে অনুকূল প্রতিকূল উভয় অবস্থার মধ্যদিয়েই সামনে এগিয়ে আসতে হয়েছে। খৃষ্টীয় তের এবং চৌদ্দ শতকের মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস ছিল বড় করুণ ও মর্মান্তিক। সর্বত্র অশান্তি, অস্থিরতা ও ভাঙনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। তাদের সকল ঐতিহাসিক বীরত্বের কাহিনী যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা মুসলমানদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল।

ঠিক সে সময় অর্থাৎ তের শতকের প্রারম্ভে মঙ্গোলিয়ার মরুচারী তাতারিয়া গোষ্ঠী প্রগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য বর্বরদের অনুকরণে তাদের দলপতি চেংগীজ খানের নেতৃত্বে মুলসিম জাহানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম আজকের রুশ অধিকৃত বুখারার তৎকালীন শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জীহুন নদীর উত্তরে এক বিশাল প্রান্তরে সুলতানের চার লাখ আট হাজার সৈন্য চেংগীজ বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং প্রথম দিনের যুদ্ধেই এক লাখ ৬০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এভাবে পরবর্তী যুদ্ধে সুলতান মুহাম্মদের সৈন্যরা নির্মমভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর মঙ্গোলীয় তাতার সৈন্যরা মুসলিম রাজ্যগুলো একের পর এক ধ্বংস করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্য দিক থেকে সুসমৃদ্ধ দামেশক ও তৎকালীন মুসলিম দুনিয়ার রাজধানী বাগদাদ নগরীও তাতারীদের অত্যাচার ও ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক এ পতনের সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে মুসলমানরা ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রেও অধঃপতনের শেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। তৎকালীন

সময় শিক্ষিত বলতে সমাজের আলিমদেরকেই বুঝাতো। আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ চরমে উঠে। সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করেও একদল মুসলমান আরেক দলকে নির্মমভাবে হত্যা করতে ও তিরস্কারবানে জর্জরিত করতে দ্বিধা করতো না। আলিমদের পারস্পরিক হিংসা -বিদ্বেষ দলাদলির ফলে মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলমানদের সেই অনৈক্যের সুযোগে দুশমনরা এ জাতির সব তছনছ করে ফেলে।

অপরদিকে ইসলামের প্রাণসত্তাকে নিঃশেষকারী বিদ'আত, শিরক,পীর পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কার মারাত্মকরূপে বিস্তার লাভ করে। তাওহীদের বাস্তব সংজ্ঞা এক রকম বিলুপ্ত হবার পথে। কুরআন, সুন্নাহ্*র শিক্ষা অনুসরণের চাইতে বিদ'আতী পীর-মাশায়েখের বক্তব্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। ইসলামের বিশুদ্ধ ধারণা ও এর নির্মল জ্যোতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। অজ্ঞতার অন্ধকার যখন এভাবে মুসলমানের ঈমানী জ্যোতিকে প্রায় নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিল, ঠিক তখনই দামেশকের আকাশে এক উজ্জ্বল সূর্যের উদয় ঘটলো। তিনিই হলেন আল্লামা তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে কাসিম শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া আল হাওয়ানী আল দামেশকী।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত হয়ে বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি এ সবের বিরুদ্ধে এক রকম জিহাদ ঘোষণা করেন। জিহাদী প্রেরণাদিপ্ত তাঁর এই সংস্কারধর্মী আন্দোলন ছিল বহুমুখী। লেখা, বক্তৃতা ও আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ সকল উপায়ে তাঁর এই প্রতিরোধ চলে। সকল প্রকার বিরোধিতা ও অজ্ঞতার মধ্যেই তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নির্ভীকভাবে কাজ করে যান। ন্যায় এবং সত্যের বাণীকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্টেরই সম্মুখীন হতে হয়। তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। কারা-জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা তিনি ঈমানী শক্তি বলে সহ্য করেন।

শাসকবৃন্দ রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারাদের অনৈসলামিক ভূমিকার প্রতিবাদ ও

বিরোধিতার কারণেই তিনি তাদের রোষানলে পড়েন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) সততা, নিঃস্বার্থতা ও আল্লাহ্*র পথে ঈমানী দৃঢ়তার পরিচয় দিতে গিয়ে যেই জুলুম-নিপীড়ন ও ভ্রুকুটি সহ্য করেছেন, তার নজির অতি বিরল । দীনের জন্যে আত্মত্যাগের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যদি "আফজালুল জিহাদ" তথা "অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ"-এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথ দেখিয়ে না যেতেন, তাহলে পরবর্তী যুগে বিভ্রান্ত অত্যাচারী মুসলিম শাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মারমুখো ব্যক্তিদের সামনে হক কথা বলার লোকের অভাব দেখা দিত। সংগ্রামী ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর গোটা কর্ম জীবনের প্রতি তাকালে তাঁর সম্পর্কিত এ সকল বক্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলার কোন উপায় নেই। প্রায় আটশ বছর অতীত হয়ে যাবার পরেও তাঁর লিখিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। মিসর,হেজাজ, ইরান প্রভৃতি দেশের অসংখ্য লাইব্রেরীতে ইবনে তাইমিয়া (র)-এর গ্রন্থাবলী সংশ্লিষ্ট সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে আছে। বার্লিন, লন্ডন, ফ্রান্স ও রোমের বহু পাঠাগারের শোভাবর্ধন করছে এ সংগ্রামী মনীষীর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলী।

তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা একদিকে ইসলামের "সীরাতুল মুস্তাকীম"কে যাবতীয় আবিলতা মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে সকলকে যাবতীয় বিভ্রান্তির পথ পরিহার করে আল্লাহ্*র শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর যুগে যে তাগুতী শক্তি ইসলাম এবং মুসলমানদের চলার পথকে অবরোধ করে এগিয়ে এসেছিল, তিনি তার বিরুদ্ধে তরবারীও ধারণ করেন। ফলে চেংগীজী বর্বরদের পাশবিক বিক্রমকেও এর সামনে প্রতিরুদ্ধ হতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) যেভাবে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে গেছেন, পরবর্তী যুগে সঠিকভাবে প্রতিটি মুসলিম দেশের ইসলামী নেতৃত্ব যদি সেই জিহাদী ভাবধারা অনুসরণ করতে পারতেন, তাহলে মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস অন্যভাবে গড়ে উঠতো। তা না হওয়াতেই মুসলমানরা আজ সর্বত্র তাগুতী শক্তির করুণার পাত্র।

জন্ম

৬৬১ হিজরী সালে রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখ হাররান নামক এক শহরে

ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জন্ম হয়। তাঁর সাত বছর বয়সে যখন এ শহরটি তাতারীদের আক্রমণের শিকার হয়, তিনি তখন তাঁর পিতার সাথে জন্মভূমি ত্যাগ করে দামেশকে চলে যান। কুরআন হিফজসহ অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা তিনি ঘরেই লাভ করেন। অতঃপর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র দামেশকের বড় বড় সুদক্ষ উস্তাদদের কাছে তিনি ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর জ্ঞান,বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম-কৌশলের কথা অল্পদিনেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্ব এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, জনগণ এই বলে বলাবলি করতো, "ইমাম তাইমিয়া যে হাদীসকে হাদীস বলে জানেনা, তা আদৌ হাদীস নয়"। ইবনে তাইমিয়া সকল সমস্যার সমাধান কুরআনের আয়াতের আলোকে পেশ করতেন। তিনি পূর্ববর্তী যুগের তাফসীরকারকদের কোন ভ্রান্তি থাকলে, তা পরিস্কার ভাষায় তুলে ধরতেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে, তিনি এই জ্ঞান বৈদগ্ধ ও দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর, সরস ও মিষ্ট; ঐতিহাসিক ইবনে কাসীরের মতে "ইবনে তাইমিয়া (র)-এর উপদেশপূর্ণ অপূর্ব ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে অনেক বড় বড় পাপী, আল্লাহ্*দ্রোহীও তওবা করে সৎপথের অনুসারী হয়েছে"। শেখ সালেহ তাজুদ্দীন বলেনঃ আমি ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অধ্যাপনা কক্ষে রীতিমতো হাযির হতাম। তিনি বন্যার গতিতে ছুটতেন, খরস্রোতা নদীর মত প্রবাহিত হতেন। শ্রোতামন্ডলী চোখ মুদে স্তব্ধ বসে থাকতো। অধ্যাপনা শেষে তাঁকে অধিক গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর মনে হতো অথচ তিনি ছাত্রদের সাথে স্নিগ্ধ হাসি ও খোশ মিজাযে কথা বলতেন। অধ্যাপনার সময় তাঁকে মনে হতো, তিনি এক অদৃশ্য জগতে বিচরণ করেছেন এবং পর মুহূর্তে দুনিয়ার বাস্তব জগতে ফিরে এসেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কারা-প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করলেও তাঁর স্বল্পকালীন শিক্ষকতার যুগে ছাত্রদের সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর কয়েকজন ছাত্র যারা ছিলেন বিদ্যায়, জ্ঞানে, প্রতিভায়, কর্মদক্ষতায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যেমন, আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম, আল্লামা যাহবী, হাফিজ ইবনে কাসীর, হাফিজ ইবনে কুদামাহ, কাযী শরফুদ্দীন, শায়খ শরফুদ্দীন প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকে। তখন থেকে মুসলিম সমাজের উপর গ্রীক দর্শনের বস্তুবাদী মর্মবাদের প্রভাব পড়ে। ফলে মানুষ

খাঁটি ইসলামী জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সকল কিছু চিন্তা করতে শুরু করে। আব্বাসীয় রাজত্বের শুরুতে এ যুক্তিবাদী আন্দোলন অন্ধ আবেগের রূপ নেয়। এই মু'তাযিলাবাদ "খালকে কুরআনের" ন্যায় তুমুল ঝগড়ার উৎপত্তি করে। মুতাযিলাবাদ কুরআন পন্থীদেরকে গ্রীক দর্শনের দুর্জয় প্রভাবে পরাজিত করেছিল। "কালাম শাস্ত্র" মুসলিম সমাজকে সূক্ষ্ম মানতিকী আলোচনায় ব্যস্ত রেখে বাস্তব কর্মজগত থেকে একেবারে গাফিল করে দিচ্ছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) মুসলিম দুনিয়াকে এ অবাঞ্ছনীয় অর্থহীন গুমরাহীর পথে ধাবিত হতে দেখে এর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। ৬৯৮ হিজরীতে তিনি একটি কিতাব লিখে "মুতাকাল্লেমীন"-এর আকীদা ও ধ্যান-ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন এবং একে বাতিল প্রমাণ করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল আদর্শকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ গ্রন্থ ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের বুকে তীরের আঘাত হানে। এ কিতাবের দ্বারা তিনি চিন্তা জগতে এক নতুন বিপ্লব নিয়ে আসেন। এর কারণেই তাঁর নির্যাতনমূলক জীবনের সূচনা ঘটে।

ইমামের মতবাদ সম্পর্কে মিসরের শাসনকর্তা নাসের শাহের নিকট বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ৭০৫ হিজরীতে তিনি দামেশকের গভর্নরকে স্থানীয় আলিমদের একটি মজলিস ডাকার ও ইমামের মতবাদ পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দেন। একাধিক বৈঠকে ইমামের মতই প্রাধান্য লাভ করে।

সূফীদের নাম ভাঙ্গিয়ে ভন্ডপীর-ফকীর-দরবেশের পেশাধারী একশ্রেণীর লোক যেমন আজকাল অর্থোপার্জন করে এবং তাদের কাছে অসংখ্য মানুষ ভিড় জমায়, তৎকালেও মুসলিম সমাজ এ ফিৎ*নায় কম ভারাক্রান্ত ছিল না। আহ্*মদিয়া ও নিসারিয়া ফকীর সম্প্রদায় দুটির একটি যুক্ত দল ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর বিরুদ্ধে দামেশকের গভর্নরের কাছে তিক্ত সমালোচনা করলে, তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। ইমাম অকুতভয়ে জবাব দেন, এ ফকীরদের দু'তি দল রয়েছে- (১) একটি পরহিযগারী, সাধুতা, নৈতিকতা ও দারিদ্র্যের কারণে প্রশংসার যোগ্য। তবে এদের অধিকাংশই ভন্ড ফকীর। শিরক, বিদ'আত ও কুফুরী ধারণার পংকিলতায় নিমজ্জিত। ইসলামের মৌল শিক্ষা কুরআন-হাদীসকে পরিত্যাগ করে মিথ্যা ও

প্রতারণাকেই জীবনের সম্বল করে নিয়েছে। এরা দুনিয়ার মূর্খ মানুষগুলোকে ধোঁকা দিয়ে নানা প্রকার বিদ'আত, শিরকের জালে জড়িত করে। নিজেদের পকেট ভর্তির জন্য সদাসর্বদা সাধুতার ভান করে থাকে। নিজেদের চারি পাশে এমন এক বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে নেয় যে, যারাই তাদের সংস্পর্শে যেতো, তাদের মানসিক গোলামে পরিণত হতো। নিজেদের পকেট উজাড় করে সেই বিদ'আতী ফকীরদের পদমূলে সর্বস্ব ঢেলে দিত।

ইমামকে মিসরে তলব

ইমামদের সত্য ভাষণে গভর্নর নিরব থাকলেও অন্যদের পক্ষ থেকে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণ চক্রান্ত চলে। সা'দরুল্লাহ মুঞ্জী মিসরের রাজন্যবর্গকে ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাঁরা দামেশকের গভর্নরের কাছে লিখে পাঠায় যেন ইমামকে মিসরে পাঠানো হয়। গভর্নর জবাবে বললেনঃ তাঁর সাথে দু'বার আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে কিন্তু তাঁর মতবাদে কোন দোষ পাইনি। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর প্রতি নির্দেশ এলো, "ভালো চাওতো শাহী ফরমান অনুযায়ী কাজ করতে দ্বিধা করো না"। গভর্নর মজবূর হয়ে ইমামকে মিসর পাঠান।

৭০৫ হিজরীতে ১২ই রমযান সোমবার ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) দামেশক থেকে বের হলে শহরবাসী তাঁর পেছনে পেছনে তিন মাইল পর্যন্ত গিয়েছিল। বিদায় সম্বর্ধনা আগত অশ্রুসিক্ত নয়নে ইমামের প্রতি তাকিয়ে থাকে।

মিসরে পৌঁছে তিনি কায়রো শহরে শুক্রবার দিন একটি কেল্লার অভ্যন্তরে প্রধান বিচারপতি ও রাজদরবারীদের এক সমাবেশে তাঁর মতামত নির্ভীকচিত্তে বর্ণনা করেন। কিন্তু তারপরও তিনি রেহাই পাননি। অন্য মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে আটক রাখা হয়। ৭০৭ হিজরীতে তিনি মুক্তি পান। অতঃপর তিনি জামেয়াতুল হিকাম-এর মসজিদে জুমার নামায পড়ান এবং প্রায় ৪ ঘন্টা- 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন'- (অর্থাৎ "একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি"।) আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেন। এভাবে মিসরে কিছু দিন থেকে তিনি তাঁর মতাদর্শ (ইসলাম) প্রচার করতে থাকেন এবং যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে লাগলেন। মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর

অদ্বৈতবাদের ভ্রান্তি স্বপ্রমাণ তুলে ধরতে লাগলেন। কিন্তু বিরুদ্ধাবাদীদের জন্যে এটা ছিল অসহ্য। সূফী তাজুদ্দীন সাধারণ মানুষকে সভা-সমিতির মাধ্যমে ক্ষেপিয়ে তুলে তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আনেন এবং সরকারের নিকট তাঁর শাস্তি বিধানের দাবী তোলেন। সরকার তখন তাঁকে প্রথমে নজরবন্দী এবং পরে কারাগারেই আবদ্ধ করে রাখেন। কারা-জীবনেও তিনি বসে থাকেননি। নানান প্রকার অবৈধ খেল-তামাশা ও লক্ষ্যহীন জীবনবোধে লিপ্ত কয়েদীদের মধ্যে তিনি ইসলামের শিক্ষা দান কাজ শুরু করেন। তাদের নামাযী ও চরিত্রবান করে তোলেন। এতে জেলখানার পথহারা মানুষগুলো মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়।

কারা প্রকোষ্ঠে ইমাম ইবনে তাইমিয়া

শত্রুরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর এ কাজের টের পেয়ে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ার জেলে স্থানান্তর করে। এখানে একটি দুর্গে ১৮ মাস থাকাকালে একাধিকবার তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যাতে মুসলিম জাহানের লোকেরা কেঁদে কেঁদে অস্থির হতো। ৭০৯ হিজরীতে বাদশাহর হুকুমে তিনি মুক্তি পেয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কায়রো রওনা দিলে স্থানীয় জনগন এক বিরাট মিছিল করে তাঁকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। কায়রোর মাশহাদ-এ তিনি অবস্থান কালে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

এ সময় (৭১১ হিঃ) জামে মসজিদে প্রতিপক্ষীয় একদল লোক এসে ইমামের উপর হামলা করে এবং তাঁকে এক নির্জন ঘরে আটক করে নির্মমভাবে প্রহার করে। শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর নিকট লোকজন দলে দলে দৌড়ে আসে এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, হুযূর অনুমতি দিলে গোটা মিশর সহর জ্বালিয়ে দেব। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রতিশোধ না নিয়ে বরং বললেনঃ আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। এরপরও তিনি অনেক দিন মিসরে থেকে পরে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করে স্বদেশ ভূমি দামেশকে ফিরে আসেন। জনগণ আনন্দে মিছিল করে তাঁর আগমন সম্বর্ধনা জানায়।

স্বদেশ ভূমি দামেশকে প্রত্যাবর্তন

দামেশকে আসার পর তিনি দীনী শিক্ষা বিস্তার, গ্রন্থ প্রণয়ন ও মানব সেবামূলক কাজে হাত দেন। তাঁর নির্ভীক কর্মতৎপরতা ও স্পষ্ট ভাষণে কায়েমী স্বার্থবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের গা-জ্বালার সৃষ্টি হয়। তারা আবার সরকারের কাছে অভিযোগ আনলে এ মর্মে সরকারী ফরমান জারী হয় যে, ইবনে তাইমিয়া আর কোন ফতোয়া জারী করতে পারবেন না।

কিন্তু ইমাম বললেন, " সত্য গোপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়"। তাঁর পক্ষ থেকে সরকারী ফরমানের এহেন বিরুদ্ধাচরণে ৭২০ হিজরীতে 'দারুস্* সাদাত' –এ অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে ইমামকে পুনরায় বন্দী করার সরকারী ফরমান জারী হয়। তখন তিনি পাঁচ মাস আঠার দিন পর্যন্ত দুর্গে বন্দী ছিলেন। এক বছর পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হলে তিনি সেই পুরাতন কাজ শুরু করেন। ইমাম জ্ঞান প্রসারের কাজে নিমগ্ন হন। তিনি দেখলেন, বহু বুযুর্গের কবর পূজা হচ্ছে। মকসূদ হাসিলের জন্য হাজার হাজার মানুষ কবরে শায়িত বুযুর্গদের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্যে দলে দলে ছুটে আসছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ৭২৬ সনে ফতোয়া জারী করলেন যে, " কবর যিয়ারত করার নিয়তে দূর দেশ সফর করা জায়েয নয়। এ ফতোয়া জারীর পর তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধবাদীরা বড় বড় সভা করে তাঁর বিরুদ্ধে আগুন ঝরা বক্তৃতা দেয়। মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। কেউ বলে জিহ্বা কেটে দিতে হবে, কেউ বলে চাবুক মারতে হবে। কারও মত হলো যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে। একদল মিসরের বাদশাহ্*র কাছে দাবী তুলল, তাঁকে যেন কতল করা হয়। পরে সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রেফতারকারি পুলিশ তাঁর নিকট গেলে তিনি সহাস্যে তাদের সাথে কারাগারে চলে যান। বাগদাদে এ খবর পৌঁছুলে সেখানকার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ আলিমগণ ইমামের ফতোয়াকে ইসলামের মূল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে তাঁর প্রতি সমর্থন জানায়। তাঁরা বাদশাহর কাছে দু'খানা চিঠি পাঠান। ঐ সকল চিঠির সারমর্ম হলোঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়া যুগশ্রেষ্ঠ শতাব্দীর মুজতাহিদ ইসলামী মিল্লাতের নেতা, পৃথিবীর সমস্ত একলীমের ধনভান্ডারও তাঁর মূল্য দিতে অক্ষম। আশ্চর্যের বিষয় যে, জাতির এ কর্ণধার যেখানে রাজপ্রাসাদে থাকার কথা, তাঁকে রাখা হয়েছে কারাগারে। তাঁর প্রতি ভিত্তিহীন দোষারোপ করা হয়েছে। তাঁকে আশু মুক্তি দেয়া উচিত।

ইরাকীরা ইমামের কারা-নির্যাতনের কথা শুনলে সারা দেশে অন্তর্বেদনার প্রচন্ড আগুন জ্বলে উঠে। আলিমদের সম্মিলিত এক ঘোষণায় বলা হয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সুতরাং শায়খুল ইসলামকে দীনের খিদমতের জন্য মুক্তি দেয়া হোক। তাতে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করা হবে। বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ওলামা-এ-কিরামের এ চিঠি মিসর বাদশাহ্*র দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি কিংবা পৌঁছুলেও তা এমন সময় যে, তখন ইসলামী দুনিয়ার শতাব্দীর এ উজ্জ্বল সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মর্দে মুজাহিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া চিরদিনের তরে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) জীবনের শেষ দিনগুলো কারাগারে ইবাদত বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত ও এর গবেষণাইতেই কাটাতেন। শেষবারে ইমাম দীর্ঘ তিন বছর তিন মাস কালেরও বেশি দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। কারাগারের এ নিষ্ঠুর বন্দী জীবনও কেটেছে তাঁর অসংখ্য মৌলিক ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনায়।

ইসলামের শিক্ষা আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্*র গযব রূপে তাতারীদের যেই হামলা আসে, তখনও মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য আলিম ছিলেন, পীর-মাশায়েখ ছিলেন। কিন্তু আরাম-আয়েশ বাদ দিয়ে এ মহাবিপিওদের মুকাবিলা করা এবং মুসলিম জনতাকে সংগঠিত করার মতো লোক খুব কমই ছিল। উদ্ভাবনী জ্ঞান দিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন একমাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)। ইসলাম মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে এসেছে- বাতিলের সাথে মিতালি করে চলার জন্যে নয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়া অসহ্য কষ্ট-নির্যাতনের মধ্যদিয়ে তারই প্রমাণ রেখে গেছেন। আল্লাহ্*র দীন প্রতিষ্ঠাকল্পে বাতিলের বিরুদ্ধে লেখা, বক্তৃতা ও প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করেছেন এবং কষ্ট ত্যাগের মধ্যদিয়েও কি করে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন উন্মুক্ত গ্রন্থতুল্য এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৬২

আবু মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল আশয়ারী (রা)

Ahmad Faruq M

Senior Member

১২-২১-২০১৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাহাবাদের পাতা থেকেঃ

আবু মূসা আল আশয়ারী (রা)

==========

আব্দুল্লাহ নাম, আবু মূসা কুনিয়াত। কুনিয়াত দ্বারাই তিনি অধিক পরিচিত। পিতা কায়েস, মাতা তাইয়েব্র। তার ইসলাম পূর্ব জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। তথাকার আল আশয়ার গোত্রের সন্তার হওয়ায় তিনি আল আশয়ারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত আবু মূসা ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইয়ামান থেকে মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে বাইয়াত হন। মক্কার আবদু শামস গোত্রের সাথে বন্ধু সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর স্বদেশবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়ামান ফিরে যান। হযরত আবু মূসা ছিলেন তার খান্দানের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। খান্দানের লোকেরা খুব দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে দাওয়াতে সাড়া দেয়। প্রায় পঞ্চাশজন মুসলমানের একটি দলকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. এর কাছে যাওয়ার জন্য ইয়ামান থেকে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। সমুদ্রের প্রতিকুল আবহাওয়া এ দলটিকে হিজাযের পরিবর্তে হাবশা ঠেলে নিয়ে যায়।

এদিকে হযরত জাফর বিন আবী তালীব ও তার সংগী সাথীরা যারা তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন, মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আবু মূসা তার দলটিসহ এই কাফিলার সাথে মদীনার পথ ধরলেন। তারা মদীনায় পৌছলেন, আর

এদিকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় ফিরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আবু মূসা ও তার সংগী সকলকে খাইবারের গনীমতের অংশ দান করেন। হযরত আবু মূসা মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হুনাইনের ময়দান থেকে পালিয়ে বনু হাওয়াযিন আওতাস উপত্যকায় সমবেত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরক সমূলে উৎখাতের জন্য হযরত আবু আমেরের নেতৃত্বে একটি দল পাঠান। তারা আওতাস পৌছে হাওয়াযিন সর্দার দুরাইদ ইবন্যুস সাম্মাকে হত্যা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে হাশামী নামক এক মুশরিকের নিক্ষিপ্ত তীরে আবু আমের মারাত্নকভাবে আহত হন। আবু মূসা আশয়ারী পিছু ধাওয়া করে এই মুশরিককে হত্যা করেন।

হযরত আবু আমের তার মৃত্যুর পূর্বে আবু মূসা কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন্ এবং আবু মূসার কাছে এই বলে অনুরোধ করেন যে, ভাই রাসূলুল্লাহর খেদমতে আমার শেষ সালাম পৌছে দেবেন এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবেন। আবু আমের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবু মূসা তার বাহিনী সহ মদীনায ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু আমেরের অন্তীম অসীয়তের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: পানি আনিয়ে ওযু করলেন এবং আবু আমেরের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করলেন। আবু মূসা আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার জন্যও একটু দোয়া করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: হে আল্লাহ! আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েসের পাপসমূহ মাফ করে দিন। কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিন। হিজরী নবম সনে তাবুক অভিযানের তোড়জোড় চলছে। আবু মূসার সংগী সাথীরা তাকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: কাছে তাদের জন্য সওয়ারী চেয়ে আনার জন্য। ঘটনাক্রমে আবু মূসা যখন পৌছলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: কোন কারণে উত্তেজিত ছিলেন।

আবু মূসা তা না বুঝে আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার সাথীরা আমাকে পাঠিয়েছে, আপনি যেন তাদেরকে সওয়ারী দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: বসে ছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন আল্লাহর কসম তোমাদের আমি কোন সওয়ারী দেবনা। আবু মূসা ভীত হয়ে পড়লেন, না জনি

কোন বেয়াদবী হয়ে গেল। অত্যন্ত দু:খিত মনে ফিরে এসে সংগী সাল্লামখীদের তিনি এ দু:সংবাদ জানালেন। কিন্তু তখনও তিনি স্থির হয়ে দাড়াতে পারেননি, এর মধ্যে বিলাল দৌড়ে এলেন আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস কোথায় তুমি? চলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তোমাকে ডাকছেন। তিনি বিলালের সাথে রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: দরবারে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: নিকটে বাধা দুটি উটের দেকে তিনি ইঙ্গিত করে বললেন: এ দুটিকে তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও। হযরত আবু মূসা উট দুটি নিয়ে গোত্রীয় লোকদের কাছে ফিরে এসে বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তোমাদের এ দুটি উট সওয়ারী হিসেবে রুপে দান করেছেন, তবে তোমাদের কিছু লোককে আমার সাথে এমন কোন লোকের কাছে যেতে হবে যে রাসূলুল্লাহর পূর্বের কথা শুনেছিল। যাতে তোমাদের মনে এ ধারণা না হয় যে, আমি আগে যা বলেছিলাম তা আমার মনগড়া কথা ছিল। লোকেরা বলল আল্লাহর কসম আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস করি। তবে আপনি যখন বলছেন. চলুন।

এভাবে কিছু লোককে সংগে নিয়ে তিনি তার পূর্বের কথার সত্যতা প্রমান করেন। তাবুক থেকে ফেরার পর একদিন আশয়ারী গোত্রের দুইজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে গেল। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে যে কোন একটি পদ লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াক করছিলেন। তাদের কথা শুনে তার মিসওয়াক করা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আবুর দিকে ফিরে বললেন আবু মূসা আবু মূসা । আবু মূসা আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তাদের অন্তরের কথা জানতাম না। আমি জানতাম না তারা কোন পদ লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: বললেন যদি কেউ নিজেই কোন পদের আকাঙ্খী হয়, আমি তাকে কখখনো সেই পদে নিয়োগ করবোনা। তবে, আবু মূসা তুমি ইয়ামানে যাও। আমি তোমাকে সেখানকার ওয়ালী নিযুক্ত করলাম। সেই প্রাচীনকাল থেকে ইয়ামান দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ইয়ামান আকসা ও ইয়ামান আদনা। হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে ইয়ামন আকসার এবং আবু মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়ামন আদনার দায়িত্ব দেয়া হল।

দুজনকে বিদায় দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "ইয়ামন বাসীর সাথে নরমে ব্যবহার করবে, কোন প্রকার কঠোরতা করবেনা। মানুষকে খুশী রাখবে, ক্ষেপিয়ে তুলবেনা। পরস্পর মিলে মিশে বসবাস করবে।**" নিজ দেশ হওয়ার কারণে ইয়ামন বাসীর ওপর হযরত আবু মূসার যথেষ্ট প্রভাব শুরু থেকেই ছিল। তাই সুষ্ঠুভাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। পার্শ্ববর্তী ওয়ালী হযরত মুয়াজের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। মাঝে মাঝে সীমান্তে গিয়ে তারা মিলিত হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় করতেন। হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: হজ্জ আদায় করেন। হযরত আবু মূসা ইয়ামন থেকে এসে হজ্জে অংশগ্রহন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস, কি হজ্জের উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি জবাব দিলেন: হা ইয়া রাসুলুল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: প্রশ্ন করলেন: তোমার নিয়ত কি ছিল? তিনি বলেন: আমি বলেছিলাম রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: যে নিয়াত আমারও সেই নিয়ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: আবার প্রশ্ন করলেন কুরবানীর পশু সংগে এনেছ কি? তিনি বললেন না:।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: নির্দেশ দিলেন তাওয়াফ্ ও সায়ী করবার পর ইহরাম ভেঙ্গে ফেল।(সহীহুল বুখারী) উল্লেখ্য যে. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জে কিরান আদায় করেছিলেন। আর হজ্জে কিরানের জন্য কুরবানীর পশূ সংগে নিয়ে আসার আলাইহি ওয়া সাল্লাম জরুরী। হজ্জ শেষে আবু মূসা ইয়ামনে ফিরে আসেন। এদিকে আসওয়াদ আনাসী নামক এক ভন্ড নবী নবুওয়াত দাবী করে, বিদ্রোহ ঘোষনা করে বসে। এমনকি হযরত মুয়াজ বিন জাবাল আবু মূসার রাজধানী মারেব চলে আসতে বাধ্য হন। এখানেও তারা বেশী দিন থাকতে পারলেনা। অবশেষে তারা হাদরামাউতে আশ্রয় নেন। যদিও ইবনে মাকতুহ মুরাদী আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেন, তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: এর ইনতিকালে আবার বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অত:পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা: মদীনা থেকে বাহিনী পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ নির্মূল করেন। ইয়ামনের দুই ওয়ালী নিজেদের স্থানে আপন আপন দায়িত্বে ফিরে যান। হযরত আবু মূসা হাদরামাউত থেকে নিজ কর্মস্থল হাদরামাউতে ফিরে

আসেন। এবং দ্বিতীয় খলিফার খিলাফত কালের প্রথম পর্যায় অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

হযরত উমারের রা: খিলাফাতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা শুরু হলে আবু মূসা রা: জিহাদে শরীক হওয়াল প্রবল আকাঙ্খায় ওয়ালীর দায়িত্ব ত্যাগ করে হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। হিজরী ১৭ সনে সেনাপতি সা'দের নির্দেশে তিনি নাসিবীন জয় করেন। এবছরই বসরার ওয়াশী মুগীরা ইবন শুবাকে রা: অপসারণ করে তার স্থলে আবু মূসা রা: কে নিয়োগ করা হয়। খুযিস্তান হচ্ছে বসরার সীমান্ত সংগলগ্ন এলাকা। ঐ এলাকাটি তখনো ইরানীদের দখলে ছিল। হিজরী ১৬ সনে খুযিস্তান দখলের উদ্দেশ্যে হযরত মুগীরা রা: আহওয়াযে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। আহওয়াযের সর্দার অল্প কিছু অর্থ বার্ষিক করদানের বিনিময়ে মুগীরার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে সন্ধি করেন। মুগীরা ফিরে যান।

হিজরী ১৭ সনে মুগীরার স্থলে আবু মূসা দায়িত্ব গ্রহন করলে আহওয়াজবাসী কর প্রদান বন্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহ করে। বাধ্য হয়ে আবু মূসা সৈন্য পাঠিয়ে আহওয়াজ দখল করেন এবং মানাযির পযর্ন্ত অভিযান অব্যহত রাখেন। বিশিষ্ট সেনা অফিসার হযরত মুহাজির ইবন যিয়াদ রা: এই মানাযির অভিযানের এক পযার্য়ে শাহাদাত বরণ করেন। শত্রু বাহিনী তার দেহ থেকে মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করে কিল্লার গম্বুজে ঝুলিয়ে রাখে। আবু মূসা হযরত মুহাজিরের ভাই হযরত রাবীকে মানাযির দখলের দায়িত্ব দেন। রাবী মানাযির দখলে সফল হন। এদিকে আবু মূসা সোস অবরোধ করেন। শহরবাসী কিল্লায় আশ্রয় নেয়। অবশেষে তাদের নেতা এই শর্তে আবু মূসার সাথে সমঝোতায় পৌছেন যে, তার খান্দানের একশত ব্যক্তিকে জীবিত রাখা হবে। নেতা এক এক করে একশ ব্যক্তিকে হাজির করলো এবং আবু মূসা শর্ত অনুযায়ী তাদের মুক্তি দিলেন। দুভাগ্যক্রমে নেতা নিজের নামটি পেশ করতে ভুলে গেল এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী তাকে হত্যা করা হলো।

সোস অবরোধের পর আবু মূসা 'রামহরমুয' অবরোধ করেন এবং বার্ষিক আট লাখ টাকা দিরহাম কর আদায়ের শর্তে তাদের সাথে সন্ধি হয়। চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে শাহানশাহে ইরানের সেনাপতি হরমুযান শোশতার এর মজবুত কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছে। আবু মূসা শহরটি অবরোধ করে বসে আছেন। শহরটি পতনের সব

চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এক ব্যক্তি গোপনে শহর থেকে বেরিয়ে আবু মূসার ছাউনীতে চলে এলো। সে প্রস্তাব দেয়, যদি তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয় তাহলে সে শহরের পতন ঘটিয়ে দেবে। লোকটির শর্ত মনজুর হলো। সে আশরাস নামক এক আরবকে সংগে নিল।আশরাস চাদর দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে চাকরের মত লোকটির পিছে পিছে চলল। তারা নদী ও গোপন সুড়ংগ পথে শহরে প্রবেশ করে এবং নালা অলি গলি পেরিয়ে হরমুযানের খাস মহলে গিয়ে হাজির হয়। এভাবে আশরাস গোপনে শহরের সব অবস্থা পযর্বেক্ষন করে গোপনে আবার আবু মূসার কাছে ফিরে আসে এবং বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে।

অত:পর আবু মূসার নির্দেশে আশরাস দু'শো জানবাজ সিপাহী সংগে করে হঠাৎ আক্রমন করে দ্বার রক্ষীদের হত্যা করে দরযা খুলে দেয়। এদিকে আবু মূসা ও তার সকল সৈন্যসহ দরজার মুখেই্উপস্থিত ছিলেন। দরযা খোলার সাথে সাথে সকল সৈনিক একযোগে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর্ শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়। হরমুযান দৌড়ে কিল্লায় আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী কিল্লার পাশে পৌছলে হরমুযান কিল্লার গম্বুজে উঠে ঘোষনা করে যে, যদি আত্নসমর্পনে রাজী। তার শর্ত মঞ্জুর করা হয় এবং তাকে হযরতের সাথে দারুল খিলাফাত মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শোশতার বিজয়ের পর আবু মূসার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জুনদি সাবুর অবরোধ করে। এ অবরোধ বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। একদিন শহরবাসী হঠাত শহরের ফটক উন্মুক্ত করে দেয়। তারা অত্যন্ত শান্তভাবে আপন আপন কাজে ব্যস্ত। মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে তাদের এমন নি:শঙ্কভাব দেখে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলে তারা জানালো, কেন আমাদের তো জিযিয়ার শর্তে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। খোজ খবর নিয়ে জানা গেল, মুসলিম বাহিনীর এক দাস সকলের অগোচরে একাই এ নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সেনাপতি আবু মূসা দাসের এ চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন। শহরবাসী বলল, কে দাস, কে স্বাধীন তা আমরা জানিনে। শেষে এ বিষয়টি মদীনার খলিফার দরবারে উত্থাপিত হলো। খলীফা জানালো, মুসলমানদের দাসও মুসলমান। যাদেরকে সে আমান বা নিরাপত্তা দিয়েছে, সকল মুসলমানই যেন তাদের আমান দিয়েছে।

এভাবে আবু মূসার নেতৃত্বে গোটা খুযিস্তানে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এবং সেই সাথে তার অবস্থান স্থল বসরা শত্রুর হুমকি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। খুযিস্তানের পতনের পর হিজরী ২১ সনে ইরানীরা নিহাওয়ান্দে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি

নেয়। খলীফা ইমার রা: নুমান ইবনে মুকরিনকে বিরাট এক বাহিনীসহ নিহাওয়ান্দে পাঠান এবং আবু মূসা তাকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। খলীফার নির্দেশ পেয়ে বিরাট এক বাহিনীসহ তিনি নিহাওয়ান্দে পৌছেন। এ যুদ্ধেও ইরানী বাহিনী মারাত্নকভাবে পরাজয় বরণ করে। খুযিস্তান জয়ের পর বিজিত এলাকা বসরার সাথে একীভূত করার জন্য আবু মূসা আবেদন জানালেন খলীফার কাছে। এদিকে কুফাবাসীরাও কুফার সাথে একীভূত করার দাবী জানালো তাদের ওয়ালী আম্মার

ইবনে ইয়াসিরের (রা নিকট। খলীফ আবু মূসার দাবী সমর্ধন করে বিজিত এলাকা বসরার সাথে একীভূত করলেন। এ দিকে কুফাবাসী তাদের দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আম্মারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠ্। অবশেষে খলীফা কুফাবাসীদের দাবী অনুযায়ী আম্মারকে সরিয়ে হিজরী ২২ সনে আবু মূসাকে কুফার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। কিন্ত এক বছর পর হিজরী ২৩ সনে আবার বসরায় বদলী হন। এ বছরই (হি: ২৩) দাব্বা নামক এক ব্যক্তি খলীফার কাছে আবু মূসার বিরুদ্ধে নিম্নের অভিযোগগুলি উত্থাপন করে:

১. আবু মূসা যুদ্ধবন্দীদের থেতে ষাটজন সর্দার পুত্রকে নিজেই নিয়ে নিয়েছেন।

২. তিনি শাসনর্কাযের যাবতীয় দায়িত্ব যিয়াদ ইবন সুমাইয়ার ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যিয়াদ এখন সকল দন্ডমুন্ডের মালিক।

৩. তিনি কবি হুতাইয়্যাকে এক হাজার দিরহাম ইনয়াম দিয়েছেন।

৪. আকলিয়্যা নাম্মী তার এক দাসীকে দু'বেলা উত্তম খাবার দেয়া হয়; অথচ তেমন খাবার সাধারণ মানুষ খেতে পায়না।

হজরত উমার নিজহাতে অভিযোগগুলি লিখলেন। আবু মূসা কে মদীনায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অভিযোগগুলির সত্য মিথ্যা নিরুপনের জন্য যথারীতি অনুসন্ধান চালালেন। প্রথম অভিযোগটি মিথ্যা প্রমানিত হল। দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব দিলেন যে, যিয়াদ একজন তুখোড় রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক। তাকে আমি উপদেষ্টা নিয়োগ করেছি। খলীফা যিয়াদকে ডেকে পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পেলেন। যিয়াদকে তার পদে বহাল রাখার নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় অভিযোগের জবাবে বললেন, হুতাইয়্যা যাতে আমার হিজু(নিন্দা) না করে এজন্য আমি তাকে আমার নিজ অর্থ থেকে উপঢৌকন দিয়েছি। কিন্ত চতুর্থ

অভিযোগের কোন জবাব তিনি দিতে পারলেন না। হযরত উমার রা: একটু বকাবকি করে তাকে ছেড়ে দিলেন।(তাবারী)

আবু মূসা এ বছরই (হি: ২৩) ইস্পাহানে অভিযান চালিয়ে অঞ্চলটি ইসলামী খিলাফাতের অন্তর্ভূক্ত করেন। ইস্পাহান বিজয় শেষ করে ফিরে এলে সেই বছরই তাকে বসরা থেকে কুফায় বদলী করা হয়। বসরাবাসীদের ভীষন পানি-কষ্ট চিল। বিষয়টি খলীফার দরবারে পৌছানো হলো। দিজলা নদী থেকে খাল কেটে বসরা শহর পযর্ন্ত নেওয়ার জন্য খলীফা নির্দেশ দিলেন। আবু মূসার নেতৃত্বে দশ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করে বসরাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করা হয়। ইতিহাসে এ খাল নহরে আবি মূসা নামে প্রসিদ্ধ। হিজরী ২৩ সনে জিলহজ্জ মাসে দ্বিতীয় মাসে

খলীফা উমার শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উসমান(রা খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহনের পর প্রশাসনের কাঠামোতে অনেক রদবদল করেন। কিন্তু হিজরী ২৯ সন পযর্ন্ত আবু মূসা বসরার ওয়ালী পদে বহাল থাকেন। হিজরী ২৯ সনে কুর্দীরা বিদ্রোহ ঘোষনা করে। আবু মূসা মসজিদে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্ম্পকে এক জ্বালাময়ী ভাষন দান করেন। ভাষনে আল্লাহর রাস্তায় পায়ে হেটে চলার ফযীলত বর্ণনা করেন। তার প্রতিক্রিয়া স্বরুপ কিছু মুজাহিদ তাদের নিকট ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেটে চলার জন্য প্রস্তত হয়ে গেল।

আবু মূসার সমালোচক তাদেরকে বলল: আমাদের এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হবে না। দেখা যাক আমাদের আমীর আবু মূসা কিভাবে চলেন। আবু মূসা ও ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বের হয়ে এলেন। মুজাহিদরা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রতিবাদ করে বসল। আসলে আবু মূসার ভাষনের অর্থ এমন ছিলনা যে, যাদের ঘোড়া আছে তারা তাদের কাঝে তা ব্যবহার করবে না। বস্তত: তখন সময়টি ছিল ফিতনা ও ষড়যন্ত্রের। হাঙ্গামাবাজরা এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদীনায় চলে গেল এবং তার অপসারণ দাবী করলো। খলীফা উসমান তাকে সরিয়ে নিলেন। হিজরী ৩৪ সনে কুফাবাসীদের সাঈদ ইবনুল আসের স্থলে খলীফা উসমা, আবু মূসা কে আবার কুফার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। খিলাফতের সবর্ত্র তখন চলছে দারুণ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: এর কথা আবু মূসা র স্মরণে ছিল। তাই তিনি তার বক্তৃতা ভাষনে সবর্দা কুফাবাসীদের এ ভবিষদ্বানীর কথা শোনাতেন। তাদেরকে সব ফিতনা থেকে দুরে থাকার উপদেশ দিতেন।

হিজরী ৩৫ সনে হযরত উসমানের (রা শাহাদাত ও হযরত আলীর খলীফা হওয়ার পর সেই ফিতনা আত্নপ্রকাশ করে। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের রা: রক্তের কিসাসের দাবীতে সোচ্চার হয়ে হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবাইর রা: মক্কা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে খলীফা হযরত আলী রা: উপস্থিত হলেন যি'কার নামক স্থানে। অন্যদিকে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের সাথে হযরত হাসানকে পাঠালেন কুফায়। হযরত হাসান যখন কুফা পৌছলেন, আবু মূসা আশয়ারী তখন কুফা মসজিদে এক বিশাল মসজিদে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষন দিচ্ছিলেন। ভাষনে তিনি জনগনকে এ্ই ফিতনা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। হযরত হাসান সেথানে উপস্থিত হলেন এবং আবু মূসার রা: সাথে তার কিছু বাক বিতন্ডা হয়। আবু মূসা নীরবে মসজিদের মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং কোন রকম প্রতিবাদ না করে সোজা সিরিয়ার এক অজ্ঞাত গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তিনি গৃহযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

সিফফিনে হযরত আলী(রা ও হযরত মুয়াবিয়া রা: যুদ্ধ বিরতি ঘোষনা করলেন এই শর্তে যে, উভয় পক্ষ একজন করে দু'জন নিরপেক্ষ বিচারকের ওপর বিষয়টি নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হবে। তাদের মিলিত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মেনে নেবে। আলীর রা: পক্ষ আবু মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং মুয়াবিয়ার রা: পক্ষ আমর ইবনুল আসকে রা: বিচারক নিযুক্ত করেন। উভয় পক্ষ '*দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে একত্র হলেন। বিষয়টি নিয়ে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। অবশেষে তারা এ্*ই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, উম্মাতের স্বার্থে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে খিলাফতের পদ থেকে অপসারণ আলাইহি ওয়া সাল্লামরণ করতে হবে এবং মজলিসে শুরা তৃতীয় কাউকে খলীফা নিবার্চন করবে। তারা উভয়ে জনগনের সামনে হাজির হলেন তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষনার জন্য। আমর ইবনুল আসের অনুরোধে আবু মূসা প্রথমে উঠে সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলেন; আবু মূসা তার পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে হযরত মুয়াবিয়াকে খলীফা ঘোষনা করে বসলেন। আবু মূসা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আসলে আবু মূসা ছিলেন অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে প্রকৃতির। ধোকা ও কূটনীতি কি জিনিস তিনি জানতেন না। এ কারণে তাকে বিচারক নিযুক্ত করার ব্যাপারে হযরত আলী রা: দ্বিমত পোষন করেছিলেন। কিন্তু তার পক্ষের লোকদের চাপাচাপিতে তিনিও মেনে নেন। আমর ইবনুল আসের কুটনৈতিক জালে পরাজিত হয়ে আবু মূসা অনুশোচনায় এত দগ্ধিভূত হলেন যে, সেই মুহুর্তে তিনি মক্কার পথ ধরলেন। জীবনে আর কোন ব্যাপারে তিনি অংশগ্রহন করেননি। তার মৃত্যু সন ও স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে মক্কায় আবার কারো মতে তিনি কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি মক্কায় ইনতিকাল করেন। অনুরূপভাবে তার মৃত্যুসন হি: ৪২, ৪৪ ও ৫২ সন বলে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে হি: ৪৪ তার মৃত্যুসন। (তাজকিরাতুল হুফফাজ)।

হযরত আবু মূসা রা: জীবনের শেষ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: আদেশ নিষেধ পালনে অত্যন্ত যত্নবার ছিলেন। এমনকি যখন তার অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে এবং তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তখন মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সেই মারাত্নক মুহুর্তেও ক্ষনিকের জন্য চেতনা ফিরে পেয়ে বলে ওঠেন: যে জিনিস থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: এমন বিলাপকারিনীদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা বলেছেন। প্রথম জীবনে দারিদ্র ছিল তার নিত্য সঙ্গী। কিন্তু পরবর্তী জীবন সচ্ছলতায় কেটেছে। হযরত উমার রা: তার ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্যে যাদের হয়েছিল হযরত আবু মূসা রা: সেই সব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: জীবদ্দশায় যে ছয় ব্যাক্তি ফাতওয়া দানের অনুমতি পেয়েছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। (তাজকিরাতুল হুফফাজ) আসওয়াদ নামক একজন তাবেয়ী বলেন আমি কুফায় হযরত আলী রা: ও হযরত আবু মূসা রা: অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যাক্তি আর দেখিনি। হযরত আলী রা: বলতেন: মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবু মূসা ইলমের রঙে রঞ্জিত। তিনি সব সময় জ্ঞানী-ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে থাকতেন এবং তিনি তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। এ আলোচনা কখনও কখনও বাহাস-মুনাজিরা পর্যন্ত পৌছে যেত। বিশেষত: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও মুয়াজ বিন জাবালের রা: সাথে তার বিশেষ তর্ক-বাহাস হতো।

একবার তায়াম্মুমের মাসআলার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: ও আবু মূসার রা: মধ্যে বিতর্ক হয়। ইমাম বুখারী তায়াম্মুম অধ্যায়ে এ বিতর্ক বর্ণনা করেছেন। তিনি যে শুধু জ্ঞান পিপাসু ছিলেন তাইনা, জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য আপ্রান চেষ্টা করতেন। তিনি মনে করতেন, যতটুকু তিনি জানবেন অন্যকে তা জানানো ফরজ। একবার এক ভাষণে বলেনধ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, তার উচিত অন্য ভাইদের তা জানানো। তবে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে একটি শব্দও মুখ থেকে বের করবে না। তার দারসের পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন ধরণের। যথারীতি হালকায়ে দারস ছাড়াও কখনও কখনও লোকজন জড়ো করে তাদের সামনে ভাষন দিতেন। পথে ঘাটে কোথাও এক স্থানে কিছু লোকের দেখা পেলে তাদের কাছে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু"একটি বাণী পৌছে দিতেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি খুব কোমল আচরণ করতেন। কেউ অজ্ঞতা বশত: বোকার মত প্রশ্ন করে বসতো, তিনি উত্তেজিত হতেন না। অত্যন্ত নরম সুরে তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

পবিত্র কুরআনের সাথে আবু মূসার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। রাত-দিনের প্রায় প্রতিচি মূহুর্ত কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ব্যয় করতেন। ইয়ামনের ওয়ালী থাকাকালে একবার মুয়াজ বিন জাবাল জিজ্ঞেস করেছিলেন. আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? বললেন: রাত্র দিনে যখনই সুযোগ পাই একটু করে তিলাওয়াত করে নিই। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: বলতেন: আবু মূসা দাউদের আ: লাহানের কিছু অংশ লাভ করেছে।

তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: খুবই পছন্দ ছিল। তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: দাড়িয়ে যেতেন। একবার হযরত আশিয়াকে রা: সংগে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবু মূসার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে সেখানেই দাড়িয়ে যান। কিছুক্ষন শোনার পর আবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সামনে অগ্রসর হন। একবার আবু মূসা জোর আওয়াজে ইশার নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সুমধুর আওয়াজ শূনে উম্মুহাতুল মুমিনীন হুজরার পর্দার কাছে এসে কান লাগিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকেন। সকালে যখন এ কথা জানতে পারলেন বললেন: আমি যদি এ কথা জানতে পারতাম তাহলে

আরো চিত্তাকর্ষক আওয়াজে তিলাওয়াত করে তাদেরকে কুরআনের আশেক বানিয়ে দিতাম। তার এই অসাসাধারণ খোশ লাহানের কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: মুয়াজ বিন জাবালের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে তাকেও নওমুসলিমদের কুরআনের তালীম দানের জন্য ইয়ামনে পাঠান। পবিত্র কুরআনের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে হাদীছের খিদমতেও তার অবদান কোন অংশ কম ছিলনা। কুফায় তার স্বতন্ত্র হালকায়ে দারসে হাদীছ ছিল।

এই দরসের মাধ্যমে বড় বড় মুহাদ্দিসীন সৃষ্টি হয়েছে। তার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩৬০। তন্মধ্যে ৫০ টি মুত্তাফাক আলাইহি, ৪৫টি বুখারী এবং ২৫টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কুরআন ও হাদীছে তার প্রভূত দখল থাকা সত্ত্বেও নিজের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তেমনিভাবে অন্যের জ্ঞানের কদরও করতেন। এববার তিনি মীরাস সংক্রান্ত একটি মাসয়ালায় ফাতওয়া দিলেন। ফাৎ*ওয়া জিজ্ঞেসকারী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের কাছেও বিষয়টি জিজ্ঞেস করে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ অন্যরকম ফতোয়া দিলেন। আবু মূসা নিজের ভুল স্বীকার করে মন্তব্য করেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাদের আমার কাছে আসার আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচিত নয়। হযরত আবু মূসার জীবনটি ছিল, রাসূলের পাকের জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সর্বদা তিনি চেষ্টা করতেন রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: প্রতিটি কাজ, চলন, বলন, ইত্যাদি হুবহু অনুকারণ ও অনুসরণ করতে। একবার তিনি মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। পথে ইশার নামাজে দুউ রাকায়াত আদায় করলেন। তারপর আবার দাড়িয়ে সূরা আন নিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর ১০০টি আয়াত পাঠের মাধ্যমে এক রাকায়াত আদায় করলেন। লোকেরা প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, আমি সব সময় চেষ্টা করে. যেখানে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: রেখেছেন সেখানে সেখানে কদম রাখার এবং তিনি যে কাজ করেছেন হুবহু তাই করার।

রামাদানের রোযা ছাড়াও নফল রোজা এজন্য রাখতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তা রেখেছেন। আশুরার রোযা তিনি বরাবর রাখতেন এবং মানুষকে তা রাখার জন্য বলতেন। সুন্নাত ছাড়া মুস্তাহাবেরও তিনি ভীষন পাবন্দ ছিলেন। কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করা মুস্তাহাব। শুধু এ কারণে তিনি তার নিজ কন্যাদেরকেও হুকুম দিতেন নিজ হাতে পশু জবেহ করার জন্য।

রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: নির্দেশ ছিল কোন ব্যাক্তি যখন কারো বাড়িতে যাবে তখন ভিতরে প্রবেশ করার আগে যেন অনুমতি নেয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে সে যেন ফিরে আসে। একবার আবু মূসা গেলেন খলীফা উমারের সাথে দেখা করতে। এক এক করে তিনবার তিনি অনুমতি চাইলেন, কিন্তু খলীফা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় সাড়া দিতে পারলেন না। আবু মূসা ফিরে আসলেন। অন্য এক সময় খলীফা জিজ্ঞেস করলেন আবু মূসা ফিরে গেলে কেন? বললেন, আমি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও সাড়া পাইনি তাই ফিরে গেছি। এই কথার পর তিনি এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: হাদীছটি বর্ণনা করে শুনালেন। উমার রা: বললেন, হাদীছটি তুমি ছাড়া অন্যকেউ শুনেছে এমন একজন সাক্ষী নিয়ে আসো। আবু মূসা ভয়ে কাপতে কাপেতে আনসারদের অনুসারীদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত উবাই বিন কাবও হাদীছটি শুনেছিলেন। তিনি উমারের রা: কাছে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন। শাবী বলেন: ছয়জনের কাছ থেকে ইলম গ্রহন করা হয়: উমার, আলী, উবাই,ইবনে মাসউদ, যায়িদ ও আবু মূসা ।

খলীফ উমার রা: তাকে বসরার ওয়ালী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সবরায় পৌছে তিনি সমবেত জনতার সামনে ভাষন দিতে গিয়ে বলেন আমীরুল মুমিনীন আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আপনাদের রবের কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত শিক্ষা দেব এবং আপনাদের পথ ঘাট সমূহ আপনাদের কল্যানের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবো। ভাষন শুনে জনতাতো অবাক। জনগনকে সংস্কৃতিবান করে তোলা, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত করাতো শাসকের দায়িত্বের আওতায় পড়তে পারে। কিন্তু তাদের পথঘাটসমূহ পরিষ্কার করার দায়িত্ব তিনি কেমন করে পালন করতে পারেন? ব্যাপারটি তাদের কাছে ভীষন আশ্চর্য্যের মনে হলো। তাই হযরত হাসান রা: তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : তার চেয়ে উত্তম আরোহী বসরাবাসীদের জন্য আর কেউ আসেনি। (রিজালুন হালার রাসূল) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তার সম্পর্কে বলতেন: আবু মূসা অশ্বারোহীদের নেতা।

হযরত আবু মূসার সামনে উম্মাতের কল্যান চিন্তাটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এজন্য সারাজীবন ব্যক্তিগত সব লাভ ও সুযোগের প্রতি পদাঘাত করেছেন। আলী রা: ও

মুয়াবিয়ার রা: মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে, তখন একদিন মুয়াবিয়া আবু মূসাকে বলেছেন. যদি তিনি মুয়াবিয়া সমর্থন করেন, তাহলে তার দু ছেলেকে যথাক্রমে বসরা ও কুফার ওয়ালী নিয়োগ করবেন এবং তার সুযোগ-সুবিধার প্রতিও যত্নবান হবেন। জবাবে আবু মূসা লিখলেন: আপনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন। যে জিনিস আপনি আমার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সামনে পেশ করেছেন, তার আমার প্রয়োজন নেই।

লজ্জা-শরম ঈমানের অঙ্গ। আবু মূসার মধ্যে এই উপাদানটি পরিপূর্ণরুপে ছিল। রাতে ঘুমানোর সময়ও বিশেষ ধরণের পোশাক পড়ে নিতেন, যাতে সতর উন্মুক্ত না হয়ে যায়। একবার কিছু লোককে তিনি দেখলেন, তারা পানির মধ্যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করছে। তিনি বললেন, বার বার মনে জীবিত হওয়া আমার মন:পূত তবুও একাজ আমার পছন্দ নয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৬৪

হাফসা বিনতে ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

Ahmad Faruq M

Senior Member

১২-২১-২০১৫

মহিলা সাহাবীদের পাতা থেকেঃ

হাফসা বিনতে ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

==========

উম্মুল মু’মিনীন হাফসা (রা) দ্বিতীয় খলীফা ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কন্যা। মা খুযা‘আ গোত্রের মেয়ে যয়নাব বিনত মাজ‘উন প্রখ্যাত সাহাবী ‘উসমান ইবন মাজ‘উনের আপন বোন। তিনি নিজেও একজন সাহাবী। আবদুল্লাহ ইবন উমার ও হাফসা (রা) আপন ভাই-বোন।১ হাফসা আব্দুল্লাহর চেয়ে ছয় বছরের বড়।২ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উমার (রা) বলেনঃ মক্কার কুরাইশরা তখন কা‘বা ঘরের পুনঃনির্মাণের কাজে ব্যস্ত।

বিয়ের বয়স হলে পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বনু সাহম গোত্রের সন্তান খুনাইস ইবন হুজাফার সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে দেন। এই খুনাইস মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হাবশায় হিজরাতকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন।৪ অবশ্য মূসা ইবন উকরবা ও আবু মা‘শার তাঁর হাবশায় হিজরাতের কথা উল্লেখ করেননি।৫ সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় পৌঁছে কুবার বনু আমর ইবন আওফ গোত্রের রিফা‘য়া ইবন আবদিল মুনজিরের গৃহে আশ্রয় নেন।৬ হাফসার (রা) ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ‘উমার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার নিজ গোত্র ও

খান্দানের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ হাফসাও সেই সময় পরিবারের লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।৭

স্বামীর সাথে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় আসার অল্পকাল পরেই বিধবা হন। তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও হয়নি।৮ খুনাইসের মৃত্যুর সময়কার নিয়ে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদে তাঁর দেহেরে একাধিক স্থানে জখম হয় এবং মদীনায় ফিরে এসে তাতেই মারা যান।৯ ভিন্ন মতে তিনি বদরে রাসূলুল্লাহর ('সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে ছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন বা জখম হন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামল্লাম) বদর থেকে মদীনায় ফেরার পর হিজরী দ্বিতীয় সনে তিনি মারা যান।১০ মেয়ে বিধবা হওয়ার পর পিতা উমার (রা) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়ে ও হযরত উসমানের (রা) স্ত্রী রুকাইয়্যা (রা) ইনতিকাল করেন! উমার (রা) সর্বপ্রথম উসমানের সাথে দেখা করে তাঁর সাথে হাফসার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উসমান বিষয়টি ভেবে দেখবো বলে সময় নেন। কয়েক দিন পর, 'আমি এ সময় বিয়ে করতে চাচ্ছি না'-বলে জবাব দেন। তারপর উমার (রা) গেলেন আবু বকরের (রা) কাছে। বললেনঃ আপনার সাথে আমি হাফসা কে বিয়ে দিতে চাই। আবু বকর (রা) চুপ থাকলেন, কোন জবাব দিলেন না। উসমানের (রা) জবাবে উমার (রা) যতখানি আহত হন তার চেয়ে বেশি হন আবু বকরের (রা) আচরণে। উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খিদমতে হাজির হয়ে মনের দুঃখ প্রকাশ করেন।১১ ইবনুল আসীর বলেন, ওমার (রা) প্রথমে আবু বকরকে (রা) প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দেওয়ায় উসমানকে (রা) প্রস্তাব করেন।১২ 'আয়িশার (রা) সাথে বিয়ের মাধ্যমে আবু বকরের (রা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু উমারের (রা) সাথে কোন আত্মীয়তা ছিলনা। হাফসার (রা) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে বিয়ের মাধ্যমে এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর মর্জি চিল। উমারের (রা) দুঃখের কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হাফসা কে বিয়ে করবে উসমানের চেয়েও ভালো এক ব্যক্তি এবং উসমান বিয়ে করবে হাফসার চেয়েও ভালো এক মহিলাকে।১৩ অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) বলেন আমি কি তোমাকে উসমানের চেয়ে ভালো জামাই এবং উসমানকে তোমার চেয়ে ভালো শ্বশুরের সন্ধান দেব না? উমার বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই দেবেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার মেয়ে হাফসা কে আমার সাথে বিয়ে দাও, আর আমার মেয়ে উম্মু কুলসুমকে বিয়ে দিই উসমানের সাথে।১৪ এভাবে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যায়। হাফসার পিতা উমার নিজেই ওলি হয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসা কে চার শো দিরহাম দেন মোহর দান করেন।১৫ উমারের (রা) প্রস্তাবে উসমান ও আবু বকরের (রা) সাড়া না দেওয়ার কারণ হলো, তাঁর রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামল্লাম) হাফসার কথা আলোচনা করতে শুনেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, তিনি উমারের (রা) সম্মানার্থে হাফসা কে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু তাঁরা এ কথাটি উমারকে বলতে সাহস করেননি এই ভয়ে যে, তাঁদের বুঝার ভুলও হতে পারে।১৬ এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে হাফসার বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবার পর আবু বকর (রা) একদিন উমারের (রা সাথে দেখা করে বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন হাফসার কথা বলেছিলেন, আমি তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। এছাড়া আপনার প্রস্তাবের জবাব না দেওয়ার আর কোন কারণ ছিল না।১৭রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামল্লাম) সাথে হাফসার বিয়ে কখন হয় সে বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। এ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সময় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে। ইবনুল আসীর বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে হিজরী তৃতীয় সনে এ বিয়ে হয়।১৮ আবু উবাসয়দার মতে, এ বিয়ে হন হিজরী দ্বিতীয় সনে। আর এটাই ইবন আবদিল বার-এর মত। ইবন হাজার আল-ইসাবাহ গ্রন্থে তৃতীয় সনের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তাঁর প্রথম স্বামী উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। অনেকে বলেন, হিজরাতের ২৫ মতান্তরে ৩০ মাস পরে এ বিয়ে হন। কোন কোন বর্ণনায় ২০ মাস পরের কথাও এসেছে! অথচ উহুদ যুদ্ধ হয় হিজরাতের ৩০ মাসেরও পরে। ইবন সা'দ জোর দিয়ে বলেন, তাঁর প্রথম স্বামী বদর থেকে ফেরার পর মারা যান। ইবন সা'দ বলেন, হিজরাতের ৩০ মাসের মাথায় মা'বান মাসে এ বিয়ে হয়।২০ হাফসার(রা) মৃত্যুসন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে,

তিনি ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আমীর মু'য়াবয়িার ৯রা) খিলাফতকাল এবং মদীনার গভর্ণর তখন মারওয়ান। তিনি জানাযার নামায পড়ান, লাশের সাথে বাকী গোরস্থান পর্যন্ত যান এবং দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকেন। আলে হাযামের বাড়ী থেকে মুগীরার বাড়ী পর্যন্ত লাশবাহী খাটিয়ায় তিনি কাঁধ দেন এবং সেখানে তার স্থলে আবু হুরাইরা (রা) কাঁধ দিয়ে কবর পর্যন্ত নিয়ে যান। হাফসার (রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এবং তাঁর ছেলেরা- 'আসিম, সালিম, আবদুল্লাহ ও হামযা লাশ কবরে নামান। এভাবে তিনি বাকী গোরস্থানে সমাহিত হন। উল্লেখিত মতটি মা'মার, যুহরী ও সালিমের সূত্রে আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন।২১ তবে ইবনুল আসীরে ঝোঁক এই দিকে যে, যে সময় হাসান ইবন আলী (রা) আমীর মুয়াবিয়ার (রা) হাতে বাইয়াত করেন সেই সময় হাফসা র ওফাত হয়। আর সেটা ৪১ হিজরীর জামাদিউল আওয়াল মাস। আর এই সনকে আমুল জামা'য়াহ বলা হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হিজরী ২৭ সনে উসম্যানের (রা) খিলাফতকালে মারা যান। এ মতটির ভিত্তি হলো, ওয়াহাব ইবন মালিক বলেছেন, যে বছর আপ্রিকা বিজয় হয়, সেই বছর তিনি মারা যান। আর আফ্রিকা বিজয় হয় হিজরী ২৭ সনে। কিন্তু এ এক মারাত্মক ভুল। কারণ আফ্রিকা বিজয় হয় দুইবার। প্রথম বিজয় হয় হিজরী ২৭ সনে, আর দ্বিতীয় বিজয় হয় মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে। এ বিজয়ের গৌরবের অধিকারী ছিলেন মু'য়াবিয়া ইবন খাদিজা (রা)।২২ মৃত্যুকালে হাফসা আলাইহি ওয়া সাল্লামর (রা) বয়স হয়েছিল ৬৩ অথবা ৫৯ বছর।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমারকে (রা) একই উপদেশ দান করেন যা তাঁর পিতা উমার (রা) তাঁকে মৃত্যুর সময় দান করেছিলেন। পিতা তাঁকে গাবা'তে যে ভূ-সম্পত্তি দিয়ে যান তিনি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দেণ।২৩ হাফসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রা) কোন সন্তান রেখে যাননি।২৪ হাফসার (রা) সন্তানাদি না থাকলেও তিনি অনেক স্নেহভাজন নারী ও পুরুষ রেখে যান যারা তাঁর নিকট হাদীস শুনেছিলেন এবং তা বর্ণনাও করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন উমার, হামযা ইবন আবদিল্লাহ, সাফিয়্যা বিনত আবী উবায়দা (আবদুল্লাহর স্ত্রী), মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদায়া, উম্মু মুবাশশির আল আনসারদের সারিয়্যা, আবদুর রহমান ইবন হারেস ইবন হিশাম,

আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, শুতাইর ইবন শাকাল, সালওয়া আল-খুযাঈ, আল-মূসায়্যিব ইবন রাফে, আল-মাজলায ও আরো অনেকে।২৫ হাফসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রা) থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলি তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পিতা উমার (রা) থেকে শুনেছিলেন।২৬ তার বর্ণিত চারটি হাদীস মুত্তাফাক 'আলাইহি এবং চয়টি হাদীস বুখারী হাদীস বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।২৭ হযরত হাফসার (রাঃ) তৎকালীন আরবের অন্য সকল নারী-পুরুষের মতই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে পিতা উমার (রা) ও স্বামী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেয়ে বড় শিক্ষক আর কে হতে পারতেন? তাঁদের প্রতিপালক ও তত্ত্বধানে তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জন ও দীনকে বুঝার প্রবল আগ্রহ জন্ম নেয়। দীনী বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিভিন্ন ঘটনায় তা জানা যায়। একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আশা করি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রণকারীগণ জাহান্নামে যাবে না।' হযরত হাফসা (রা) বলে উঠলেন, আল্লাহ তো বলেছেনঃ আরবী হবে

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (জাহান্নামে) পৌঁছবে না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে একথাও তো আল্লাহ বলেছেনঃ আরবী হবে

''অতঃপর আমি খোদাভীরু লোকদের উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।'' (সূরা মারইয়াম-৭১-৭২)২৮ হাফসার (রা) মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রাসূলে কারীমও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবসময় তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর চিন্তা করতেন। হযরত শিফা বিনত আবদিল্লাহ ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। হযরত হাফসা তাঁর নিকট লেখা শেখেন। এই শিক্ষা নামলা'২৯ নামক এক প্রকার ক্ষত-রোল নিরাময়ের ঝাঁক-ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললেনঃ আমি জাহিলী জীবনে ঝাঁড়-ফুঁক করতালম। আপনি আনুমতি দিলে তা আমি আপনাকে শুনাই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনে বললেন, এই ঝাঁড়-ফুঁকটি তুমি হাফসাকে ও শিখিয়ে দাও। অন্য একটি বর্ণায় এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) শিফাকে বলেন, তুমি কি হাফসাকে এই নামলা'র দু'আটি শিখিয়ে দেবে না যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছো?৩০ রাসূলে পাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী জীবনে হাফসা (রা) প্রচুর ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। সব সময় রোযা রাখতেন এবং অতিমাত্রায় রাত জেগে নামায আদায় করতেন। জিবরীল (আ) তাঁর সম্পর্কে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিনি অতিমাত্রায় সিয়াম পালনকারিণী এবং রাতের বেলাতে খুব বেশি ইবাদাতকারিণী।৩১ অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল (আ) বলেনঃ তিনি একজন সৎকর্মশীলা নারী।৩২ তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রোযা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।৩৩ তিনি সব রকমের মতবিরোধকে অপছন্দ করতেন। সিফফীন যুদ্ধের পর যখন দুমাতুল জান্দালে শালিশ-ফয়সালার বিষয়টি এরো তখন তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তা একটি ফিতনা ফাসাদ মনে করে ঘর থেকে বের হতে চাইলেন না। কিন্তু হাফসা তাঁকে বললেন, এতে অংশগ্রহণে তোমার কোন লাভ নেই, তবে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ, মানুষ তোমার মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। এমনও হতে পারে, তোমার এই দূরে থাকা তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে।৩৪ অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেনঃ উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে আপোষ-মীমাংষা হতে পারে এমন কোন বিয়ষ থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়। তুমি হচ্ছো রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্যালক এবং উমার ইবনুল খাত্তাবের ছেলে।৩৫ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকালের পর হাফসা আলাইহি (রাঃ) জনগণের পক্ষে বিভিন্ন দাবী নিয়ে খলীফাদের সাথে, বিশেষত তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলীফা উমারের (রা) সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলীফাও তার মেয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ রকম কিছু ঘটনা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়।

'উমার (রা) খলীফা হওয়ার পরও প্রথম খলীফা আবু বকরের (রা) সময় তঁর জন্য নির্ধারিত ভাতার উপর নির্ভর করে সংসার চালাতেন। কিন্তু তাতে তার সংসার ভালো মত চলে না দেখে উসমান আলী তালহা যুবাইর (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী একত্র হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে খলীফা উমারের (রা) সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিড়ারের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে? বিষয়টি নিয়ে খলীফার সাথে কথা বলতে তাঁরা কেউ সাহস পেলেন না। শেষমেষ তাঁরা হাফসার দ্বারস্থ হলেন এবং তাকেই খলীফার সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ

করলেন। হাফসা (রা) কথা বললেন, কিন্তু খলীফা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের আড়ম্বরহীনতা ও সরলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে বিদায় দেন।৩৬ আর একবার তিনি তাঁর পিতা খলীফা উমারকে (রা) তাঁর পোশাক ও খাদ্যের মান বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা এখণ তো মুসলমানদের জীবিকায় আগের চেয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন। উমার (রা) তাঁর মেয়েকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খুব কাঁদলেন।৩৭

একবার খলীফা উমারের (রা) নিকট কিছু অর্থ-সম্পদ এলো। হাফসা এসে বললেনঃ হে আমীলুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা নিকট-আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন। এই সম্পদে আপনার নিকট আত্মীয়দের অধিকার আছে। মেয়ের কথা শুনে খলীফা বললেনঃ আমার নিট আত্মীয়দের অধিকার আমার সম্পদে। আর এই সম্পদ তো মুসলমানদের। মেয়ে, তুমি তোমার পিতাকে ধোঁকায় ফেলছো। ওঠো, এখান থেকে যাও। এরপর হাফসা চাদরের আচল টানতে চাইতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।৩৮ ইব জুরাইজ থেকে বির্ণত হয়েছে খলীফা উমার (রা) একদিন রাতের বেলা কা'বা তাওয়াফ করা অবস্থায় এক মিলঞাকে করুণ সুরে একটি বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন। যার দুইটি পংক্তি এই রকমঃ

আরবী হবে

-এই রাত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়েছে, চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। একাকী আমি জেগে আছি, পাশে কোন প্রিয়জন নেই যার সাথে প্রেমালাপ করতে পারি। -আল্লাহ-যিনি অতুলনীয়, যদি তাঁর ভয় না থাকতো হাতলে এই শয্যাধারের চারপাশ অবশ্যই কম্পিত হতো।

খলীফা উমার (রা) মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি হয়েছে? মহিলা বললোঃ কয়েক মাস যাবত আমার স্বামী আমার থেকে দূরে আছে। তাঁকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি আমার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে। তারপর উমার (রা) মেয়ে হাফসার কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চাই, আমাকে তুমি সাহায্য কর। মেয়েরা স্বামী থেকে দূরে থাকলে কতদিন পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে? হাফসা লজ্জায় মাথানত করে ফেলেন। উমার বললেনঃ আল্লাহ সত্য প্রকাশের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তখন

হাফসা হাত দিয়ে উশারা করে তিন অথবা চার মাস বুঝিয়ে দেন। তখন উমার (রা) নির্দেশ দেন, কোন সৈনিককে যেন চার মাসের অধিক আটকে রাখা না হয়।৩৯ আল-বায়হাকী (৯/২৯) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন আমার (রা) রাতের বেলা নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে এক মহিলাকে উপরোক্ত পংক্তি দুইটি গাইতে শোনেন। তারপর তিনি হাফসাকে জিজ্ঞেস করেনঃ মেয়েরা সর্বাধিক কতদিন স্বামী ছাড়া থাকতে পারে? হাফসা বলেনঃ ছয় অথবা চার মাস। উমার (রা) বলেনঃ আমি এর চেয়ে বেশিদিন কোন সৈনিককে আটকে রাখবো না।৪০ হাফসা (রা) ছিলেন উমারের (রা) কন্যা। পিতার মত তাঁর মেজাজেও ছিল কিছুটা তীক্ষ্মতা। কখনো কখনো রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথার পিঠে কথা বলতেন। ততে দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্যের উপক্রম হতো। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বুখারীসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েচে। উমার (রা) একবার ইবন আববাসকে (রা) বললেনঃ জাহিলী আমলে কুরাইশ নারীরা পুরুষের অনুগত ও বাধ্য থাকতো। আমরা তাদের বিন্দুমাত্র মূল্য দিতাম না। ইসলাম তাদেরকে মর্যাদা দান করে। তাদের সম্পর্কে বহু আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাদের স্থান ও মর্যদা অবগত হই। আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, মদীনায় নারীরা পুরুষদের বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরা তাদের কাছে শিক্ষা পেতে লাগলো। আমার বাড়ীটি ছিল আওয়ালীর বনু উমাইয়্যা ইবন যায়িদ পল্লীতে। আমি একদিন স্ত্রী উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলাম। সেও ছেড়ে দিল না, কথার পিঠে কথা শুনিয়ে দিল। তার এমন প্রত্যুর্ত্তর আমার মোটেই ভালো লাগলো না। তখন সে বললো, আমার এরূপ উত্তর করা আপনার পছন্দ নয়, অথচ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীরাও তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন। কোন কোন স্ত্রী আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তার থেকে দূরে আছেন। অন্য একিট বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেনঃ আপনার মেয়ে হাফসা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখের উপর জবাব ছুড়ে দেয়। তাতে এমন হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারাদিন বিমর্ষ থাকেন।

'উমার (রা) বলেনঃ একথা শুনে আমি হাফসার কাছে ছুটে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা কি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথার প্রত্যুত্তর করে থাকে? হাফসা বললোঃ হাঁ। আমরা এমন করে থাকি। আমি প্রশ্ন করলামঃ তোমাদের কেউ কি রাত পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাক? হাফসা

বললোঃ হাঁ। বললামঃ তোমাদের মধ্যে যে এমন করে সে সফল হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের কেউ কি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্রুদ্ধ হওয়ার পরেও আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিরাপদ মনে করেছে? তোমার চেয়ে যে বেশি সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক প্রিয় সে যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।৪২

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমার (রা) হাফসাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ সাবধান! এমন করোনা। আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। তুমি তার অহমিকার ফাঁদে পড়োনা যার সৌন্দর্য রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিমোহিত করেছে। (অর্থাৎ আয়িমা রা.)৪৩ অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হাফসাকে (রা) বলেনঃ তুমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথার উত্তর করবে না। তোমার না আছে যয়নাবের সৌন্দর্য ও আয়িশার সৌভাগ্য।৪৪ তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা বসে বসে কাঁদছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে এভাবে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। সাফিয়্যা বললেনঃ হাফসা আমাকে ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তুমি আল্লাহকে ভয় কর।' তারপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাফিয়্যাকে বললেনঃ তুমি তো একজন নবীর মেয়ে, তোমার চাচাও একজন নবী। তারপর একজন নবীর স্ত্রী। কোন ব্যাপারে হাফসা তোমার উপর গর্ব করতে পারে?৪৫ আর একবার হাফসা ও আয়িশা (রা) সাফিয়্যাকে বললেনঃ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আমরা দুইজন তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আমরা তার স্ত্রী, তদুপরি তাঁর চাচাতো বোন। কথাগুলো হযরত সাফিয়্যাকে ভীষণ আহত করে। তিনি তাঁদের বললেনঃ তুমি তাদেরকে কেন একথা বললে না যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে পার না। কারণ, আমার স্বামী মুহাম্মাদ, আমার পিতা হারূন এবং চাচা মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।৪৬ 'আয়িশা ও হাফসা (রা) পরস্পর সতীন হলেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল বোনের মত। অধিকাংশ ব্যাপারে তাঁরা একে অপরের সহযোগী ছিলেন। 'আয়িশা (রা) হাফসা সম্পর্কে বলেছেনঃ হাফসা বাপের বেটি। তাঁর বাপ যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ়সংকল্প, হাফসাও তেমন।৪৭ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হাফসাই আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন।৪৮

আমরা দুইজন ছিলাম যেন একটি হাত।৪৯ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তিম রোগ শয্যায়। জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। নামাযের সময় হলো। তিনি বললেন আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আয়িশা বললেনঃ আবু বকর একজন কোমল মনের মানুষ। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থানে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতে গেলে কান্নায় তাঁর বাকরুদ্ধহয়ে যাবে, লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না-একথাগুলি তিনি হাফসা কে বললেন এবং তাঁর স্থলে উমারকে নির্দেশ দানেরজন্য রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। আয়িশার (রা) কথামত হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেই তিনি মন্তব্য করলেনঃ 'তোমরা সবাই ইউসুফের সঙ্গী- সাথীদের মত।৫০

'আয়িশা ও হাফসা, দুইজনের মনের এমন চমৎকার মিল এবং উভয়ের মধ্যে এত ভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে নারীর স্বাভাবিক প্ররণত মাথাচাড়া দিত। স্বামীসঙ্গ ও সোহাগ প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরা ঈর্ষার শিকার হতেন। একবার একসফরে তাঁরা দুইজন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর সঙ্গী ছিলেন। রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশার উটের উপর সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। একদিন হাফসা আয়িশাকে বললেন, আজ রাতে তুমি যদি আমার উটের উপর, আর আমি তোমার উটের উপর সওয়ার হই তাহলে একটা দৃশ্য দেখা যাবে। 'আয়িশা (রা) রাজি হয়ে গলেনে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসার সাথে তাঁর বাহনে পথ চললেন। মনযিলে পৌঁছে আয়িশা যখন রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেলেন না তখন নিজের চরণ দুইখানি ইযখীর ঘাসের মধ্যে ঝুরিয়ে বলতে রাগলেনঃ হে আল্লাহ! কোন সাপ অথবা বিচ্ছু যদি আমাকে দংশন করতো।৫১ 'আয়িশা ও হাফসা ছিলেন যথাক্রমে আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) কন্যা। এই দুই মাহন ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতি কাছের মানুষ। এ কারণে, 'আয়িশা ও হাফসা দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারিবারিক জীবনে অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহহারাতের বিপরীতে একজোট। তাঁদের এই জোটবদ্ধতা নবীপাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনার পশ্চাতে কাজ করেছে।

আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের সকল ছোট-বড় ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনের মত নিছক কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা এসব ঘটনার মাধ্যমে মানব জাতিকে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আচরণের বাস্তব শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তা না হলে নবীর জীবনে এসব ঘটনা না ঘটালেও পারতেন। আমাদের প্রিয় নবীজীর জীবনের প্রতিটি ঘটনা এভাবেই দেখতে হবে।

হিজরী ৯ম সনে সূরা আত-তাহরীম অবতীর্ণ হয়। এই অবতরনের পশ্চাতে রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা। মিষ্টি ও মধু ছিল রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতি প্রিয় খাবার।তিনি সাধারণত আসরের নামাযের পর সকল সহধর্মিণীদের ঘরে গিয়ে দেখা করতেন। একদিন যয়নাবের (রা) নিকট সআবভাবিক সময়ের চেয়ে একটু দেরী হেয় যায়। এতে আয়িশার মনক্ষুণ্ণ হন। তিনি অবগত হন যে, কোন এক মহিলা যয়নাবকে কিছু মধু উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মধু যয়নাবের নিকট পান করেছেন। আর সেই কারণে তাঁর ঘরে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থান দীর্ঘ হয়েছে। আয়িশা ও হাফসা জোটবদ্ধ হন। আয়িশা হাফসা কে বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আমার অথবা তোমার ঘরে আসবেন তখন আমরা তাকে বললো, আপনার মুখ থেকে মাগাফীর-এর দুর্গন্ধ আসছে। (মাগাফীর, মাগফুর-এর বহুবচন। একপ্রকার উদ্ভিদের ফুল যা থেকে মৌমাছি মধু আহরণকরে) আয়িশা একই কথা সাফিয়্যাকেও শিখিয়ে দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁদের ঘরে আসলেন তখন তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্তমত একই কথা বললেন। রাসূলুলত্মাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট দুর্গন্ধ ছিল খুবই অপ্রিয়। এরপর তিনি যখন আবার যয়নাবের নিকট যান তিনি রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে আয়িশা আফসোসের সুরে হাফসা কে বলেনঃ আমরা একটি মারাত্মক কাজ করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

তাঁর একটি প্রিয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে নাযির হয় সূরা আত-তাহরীমের নিম্নোক্ত আয়াতঃ৫২

-হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? (আত-তাহরীম-১)

রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধু পরিবেশনকারিনী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন জনের নাম এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় হাফসার নামটি এসেছে। সে ক্ষেত্রে আয়িশা সাওদাও সাফিয়্যার সাথে দল বাঁধেন। ইবন সাদের একটি বর্ণনায় তেমনি বুঝা যায়।৫৩ কোন কোন বর্ণনায় উম্মু সালামার নামও এসেছে।৫৪ রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের খুশী করার জন্য মধু পান না করার যে সিদ্ধান্ত নেন তা তিনি সংশ্লিষ্ট গোপন রাখতে বলেন। যাতে মধু পরিবেশনকারিনী মনে কষ্ট না পান। অধিকাংশ বর্ণনা মতে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসার (রা) কাছে এই গোপন কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু হাফসা কথাটি গোপন রাখতে পারলেন না। তিনি তা আয়িশার কাছে প্রকাশ করে দেন। একথাই আল্লাহ সূরা আত-তাহরীমের তৃতীয় আয়াতে বলেছেন এভাবেঃ যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রী কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল আর আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিসয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন না এবং কিছু বললেন। নবী যখন তা স্ত্রী বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো? নবী বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।

সূরা আত-তাহরীম নাযিলের কারণ সম্পর্কে আল-ওয়াকিদীসহ আরো অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ ভিন্ন ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। একদিন হাফসা (রা) ঘরে ছিলেন না। এ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে আসেন এবং দাসী মারিয়া কিবতিয়্যাকে ডেকে সঙ্গ দেন। এর মধ্যে হাফসা ফিরে আসেন এবং অসন্তুষ্টির জন্য উক্ত দাসীর সাহচর্যকে নিজের জন্য হারাম করে নেন। আর একথা তিনি হাফসা কে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি তা গোপন রাখতে পারলেন না। আয়িশার কাছে প্রকাশ করে দেন। তখন সূরা আত-তাহরীম নাযিল হয়। নাফে বলেছেনঃ একথা কি ঠিক নয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্য তার দাসীকে হারাম করেছিলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা কসম ভঙ্গ

করে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?৫৫ যে দুইজন নাবী এসব ঘটনা সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলেন, তাঁদেই সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেন আত-তাহরীমের চতুর্থ আয়তটি। -'তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তাওবা কর, তবে ভালো কথা। আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মু'মিনগণ তাঁর সহায়।৫৬ এই দুই নারী হলেন আয়িশা (রা) ও হাফসা (রা)। এই দুইজন নারী কে, সে সম্পর্কে সহীহ বুখ্যারীতে ইবন আববাস (রা) এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে এতে তিনি বলেনঃ যে দুইজন নারী সম্পর্কে কুরআনে যদি তোমরা উভয়ে তাওবা কর'-বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে উমারকে (রা) প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি অজু করেছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন কররামঃ কুরআনের যে দুইজন নারী সম্পর্কে যদি তোমরা তাওবা কর'-বলা হয়েছে তাঁরা কে? উমার বললেণঃ আশ্চার্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুইজন হলেন হাফসা ও আয়িশা (রা)।

৫৭ নবী পরিবারের মধ্যে এই তুচ্ছ কলহ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মুনাফিকরা সব সময় ধান্দায় থাকতো খোদ নবী পরিবার ও তাঁর বিশেষ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যে কোন ধরনের ফাটল ধরানোর। তারা আযওয়াজে মুতাহহারাতের এই মামুলি বিরোধের কথা জানতে পেরে হয়তো আরো একটু উস্কে দিতে চেয়েছিল। ভেবেছিল আয়িশা ও হাফসার পিতা আবু বকর ও উমারকে (রা) এবার রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে। কিন্তু তারা জানতো না, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদতলে তাঁরা কন্যা কেন, নিজেদের জীবনও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই উমার (রা) হাফসার সাথে দেখা করার অনুমতি না পেয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেনঃ অনুমতি পেলে মাথা কেটে নিয়ে আসি।৫৮ সূরা আত-তাহরীমের ৪র্থ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়িশা ও হাফসা যদি ষড়যন্ত্র করে, আর মুনাফিকরা তা কাজে লাগায় তাহলেও আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহর সাথে আছেন জিবরীল, ফিরিশতামন্ডলী ও সমস্ত বিশ্বের মু'মিন নর-নারী।

৫৯ বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত ঘটনার পর রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসা কে (রা) তালাক দেন। তারপর আবার ফিরিয়ে নেন। একথা আসেম ইবন উমার বলেছেন।৬০ তালাক দেওয়ার পর জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হাফসা খুব বেশি রোযা পালনকারিণী এবং রাতে বেশি বেশি নামায আদায়কারিণী। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন। জিবরীলের এ কথায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার তাঁকে ফিরিয়ে নেন।৬১

ইবন সা'দ কায়স ইবন ইয়াযীদ এবং ইবন সীরীনের একটি বর্ণনা নকল করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসা কে (রা) এক তালাক দেন। তারপর হাফসার দুই মামা-কুদামা ও উসমান ইবন মাজ'উন হাফসার সাথে দেখা করেন। হাফসা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের বলেনঃ আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কোন মন্দ কাজের জন্য তালাক দেননি। এমন সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেনঃ জিবরীল আমাকে বলেছেন, আপনি হাফসা কে ফিরিয়ে নিন। কারণ, তিনি খুব বেশি রোযা পালন করেন এবং বেশি নামায আদায় করেন। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন।''

৬২''উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতে লাগলেন। লোকমুখে প্রচার হলো, তিনি তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এটা হিজাবের হুকুমের আগের ঘটনা। আমি আয়িশার কাছে গিয়ে বললামঃ আবু বকরের মেয়ে! তুমি রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দিয়ে থাক-লোকেরা সে একথা বলাবলি করছে, তাকি তুমি শুনেছো? 'আয়িশা বললেনঃ ওহে খাত্তাবের পুত্র, আমার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? আপনি অন্যত্র যেতে পারেন।

এরপর আমি হাফসার কাছে গিয়ে বললামঃ আল্লাহর কসম, আমি জেনেছি তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না। আমি না থাকলে তিনি অবশ্যই তোমাকে তালাক দিতেন। একথা শুনে হাফসা খুব কাঁদলেন। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথায়? বললোঃ পাশেই একটি ঘরে আছেন। আমি সেখানে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসা দেখতে পেলাম। দরজায় দাঁড়ানো তাঁর চাকর রাবাহ। তার মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহর

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। তিন বারের মাথায় অনুমতি পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললামঃ আপনার অনুমতি পেলে আমির কল্লা কেটে ফেলবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নরম হওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমি শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে তালাক দিয়েছেন? বললেনঃ না। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলামঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি। তখণ নাযিল হয় সূরা আন-নিসার ৮৩ তম আয়াতটি।৬৩ বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নবী পরিবারের মনোমালিন্য ও তালাক সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মাধ্যমে হাফসা আলাইহি ওয়া সাল্লামর (রা) অনেকগুরি বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এবং শরীয়াতের কিছু বিধান আমাকে কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমনঃ

তালাক দান একটি বৈধ কাজ। যদি সে তালাক হয় কোন প্রয়োজন বা কল্যাণের নিম্মিত্তে, তবে তা কামালিয়াত বা পূর্ণতার পরিপন্থী নয়।

৬৪ খোদ আল্লাহপাক হাফসার বেশি রোযা রাখা ও বেশি নামায পড়ার সনদ দিয়ে তাঁর প্রশংসার করেছেন। জান্নাতেও তিনি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।তাকে খুশী করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুইটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেন। আয়িশার (রা) বক্তব্যে জানা গেছে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মত।'

৬. দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাট মনোমালিন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

হাফসার (রা) মধ্যে প্রবল দাজ্জাল-ভীতি ছিল। মদীনায় ইবন সাইয়্যাদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের যতগুলো চিহ্ন বা আলামত বর্ণনা করেছিলেন, লোকটির মধ্যে তার অনেকগুলি ছিল। এমনকি তার সম্পর্কে খোদ রাসূলুল্লাহরও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্দেহ ছিল। একদিন হাফসা ও আবদুল্লাহ ইবন উমারের (রা) সাথে পথে সেই লোকটির দেখা হযে গেল। ইবন উমার তাঁকে কিছু বলতেই সে রেগে এত ফুলে উঠে যে পথই বন্ধ হয়ে গেল। ইবন উমার তাঁকে মারতে উদ্যত হন। হাফসা ভীত

হয়ে পড়েন। তিনি ইবন উমারকে বলেন, তার সাথে তোমার সম্পর্কে কি? তুমি কি জাননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের ক্রোধই তার বের হবার কারণ হবে?

৬৫ উম্মুল মু'মিনীন হাফসার (রা) সম্মান ও মর্যাদা ছোট একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এ পৃথিবীতে তিনি সীরাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে যেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি আখিরাতের জীবনেও একাত্ম থাকবেন বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

সূত্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা – পঞ্চম খন্ড

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৬৬

আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের নায়েবে আমীর ও দ&

Mutmain

Junior Member

১২-২৭-২০১৫

[বিগত ২৫ রবীউল আউয়াল (১৫জানুয়ারী ২০১৫ মোতাবেক) উত্তর ওয়াযিরিস্তানের লোয়ারাহের ক্যাম্পে আমেরিকান ড্রোন হামলায় আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের নায়েবে আমীর ও দাওয়াহ বিভাগের প্রধান উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ শাহাদত বরণ করেন। তিনি এবং আল-কায়েদা অন্যতম নেতা কারী ইমরানসহ অন্যান্য মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহের শাহাদত উপলক্ষে আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের মুখপাত্র উস্তাদ উসামা মাহমূদ হাফিজাহুল্লাহ একটি বার্তা দেন। যার নাম হচ্ছে 'মৃত্যুর জন্যে সত্যের এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না'। এই বার্তা থেকে উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহর এই জীবনাংশ অনুবাদ করা হলো]

ইসলামাবাদের উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহের প্রকৃত নাম রাজা মুহাম্মদ সালমান । তিনি ইলমের দ্বীনের পিপাসু ছিলেন, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ থেকে শরয়ী জ্ঞান পরিপূর্ণ করার পর যখন জিহাদের ফরজিয়্যাত তাঁকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে আসলো, তখন এখানে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা এবং অশেষ জিহাদি ব্যস্ততার মধ্যেও জ্ঞানার্জনের সফর অব্যাহত রাখেন, সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে মনোযোগী করতেন এবং সাথীদেরকে পড়ানোর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। উলামাদেরকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করতেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন দ্বীনী মাদ্রাসা সমূহের সাথে সুসম্পর্ক রাখার প্রচেষ্টা করতেন এবং ফিকহি মাসয়ালাসমূহে তাদের ফতোয়া তলব করতেন। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্যে উৎসাহিত করা এবং সমাজ সংস্কারের সুত্রধরে তাদেরকে চিঠি লিখতেন এবং নিজের মত ও নিবেদন তাদের কাছে পৌছাতেন। কথা-কাজে শরয়ী হুকুম জানার প্রচেষ্টা এবং শরয়ী মূলনীতি জানার পর সাথে সাথে এটাকে কাজে রূপান্তর করা তাঁর কাজের সুস্পষ্ট সৌন্দর্য ছিল। তাঁকে দেখে, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সতেজ হতো, আল্লাহর শরীয়তের

সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে বসে যেতো এবং তাঁর সাথে সামান্য সময় অতিবাহিত করলে ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং এরচেয়ে বেশি এর উপর আমল করার জন্যে তীব্র বাসনা সৃষ্টি হতো। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিনয় এবং ইখলাসে পরিপূর্ণ ছিলো, চেহারার মধ্য থেকেও এই উন্নত গুণ পরিলক্ষিত হতো, এটা কোনো সাময়িক, লৌকিক বা কৃত্রিম পোষাক ছিলো না, বরং বেশী নিকটে বসবাসকারীর কাছে বেশি প্রকাশিত হতো যে, তাঁর অন্তর কতো পরিষ্কার।এটা এমন নির্মোহ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, শ্রোতার অন্তরে তাঁর কথা এমন আসন তৈরি করতো যে সে প্রভাবিত না হয়ে পারতো না।

প্রসন্ন স্বভাব ও স্থির মনের অপূর্ব সমন্বয় ছিলো। মুখ ও অন্তরের হেফাজত তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। মুসলমানদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করতেন, যদি অন্য কোনো সাথী কারো ব্যাপারে কুধারণা প্রকাশ করতো তাহলে সাথে সাথে নির্দেশনা দিতেন। হাসি-কৌতুকের মধ্যেও গীবত অথবা অন্য মুসলমানদের ব্যাপারে বিদ্রূপের মতো ত্রুটি প্রকাশ পেতো না। যদি কেউ তাঁকে কষ্ট দিতো অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতো, তাহলে সবর করতেন, নিজেও নিশ্চুপ থাকতেন এবং সাথীদেরকেও এইসব ভাইদের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতেন। হাসি-কৌতুকে এই বিষয়ের লক্ষ্য রাখতেন যে অন্তর যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না হয়ে যায়, যদি কোনো মাহফিলে হাসি-কৌতুক সীমালংঘনের পর্যায়ে যেতো তাহলে সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভাইদেরকে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করতেন এবং অন্তর মৃত হওয়া বাঁচানোর স্মরণ করে দিতেন। এমন সংস্কারক ও মুরব্বী ছিলেন যে, কোন সাথী যদি কোনো সময় তার সাথে সামান্য সময় ব্যয় করে তাহলে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো। অত্যন্ত ভালোবাসা এবং কল্যাণকামিতার সাথে আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের প্রচেষ্টা করতেন। সাথীদের সাথে সহজেই মিশে যেতেন, প্রত্যেকের সাথে এই পরিমাণ ভালবাসার সম্পর্ক হতো যে, বিদ্যমান সাথীদের প্রত্যেকে এই মনে করতো যে, সেই তাঁর নিকটতম বন্ধু। ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং অন্তরের কোমলতার আমি পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, কুরআন অনুধাবনের স্পৃহা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ আমানত ছিলো, তেলাওয়াত কখনো বন্ধ করতেন না এবং তেলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দ্বারা এর মহত্ত্ব অন্তরে

বসাতে চেষ্টা করতেন, প্রভূর নির্দেশাবলী পড়ে নিজের আমলের যাচাই করতেন, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় অধিকাংশ সময় চক্ষু ভিজে ফেলতেন। শেষদিন দিনগুলোতে অবরোধের সময় যে চিঠিটি লিখেছেন, এরমধ্যেও কুরআনের আয়াতের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার আলোকে আমাদের অবস্থার সুত্রে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা পাঠিয়ে দিয়েছেন!

ফরজ জিহাদ আদায়ের অনুভূতি এবং এটাকে শরীয়ত মোতাবেক দেখার অদম্য বাসনা তাঁর শিরা-উপশিরায় বিদ্যমান ছিলো। জিহাদের ঝান্ডাকে ইলম এবং দূরর্শিতার সাথে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে দীন ও জিহাদের দায়ী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহের এই বোঝার ক্ষেত্রে এইসব তাফসীর-ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করতেন যা সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম, সালাফে সালেহীন এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সমস্ত ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরই ধারাবাহিকতায় অঞ্চলের প্রবীণ উলামায়ে কেরামদের থেকে ফায়েদা গ্রহণ করা নিজের জন্যে আবশ্যক মনে করতেন। যেহেতু জিহাদী বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উলামাগণের সাথে সাথে জিহাদাঙ্গনের শায়খদের নির্দেশনায় চলা আবশ্যক মনে করতেন, জিহাদের ময়দানে শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ, শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ ও শায়খ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুমুল্লাহের মতো শায়খদের সান্নিধ্য ও নির্দেশনায় এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। এই মহান নিয়মতের সাথে সাথে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুমাল্লাহু, শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি, শায়খ আবু ওয়ালিদ আনসারী, শায়খ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনি এবং শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি হাফিজাহুমোল্লার মতো শায়খদের পুস্তকাদি ও রচনা শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত এবং গ্লোবাল জিহাদি আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত এই মানহাজ, যা শরীয়তের প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে অনুসরণ শেখায়, তাওহীদের উম্মাহকে কালেমায়ে তাওহীদের আশপাশে জড়ো হয়ে ফরজে আইন জিহাদের দিকে আহবান করে, মসলকী ও শাখাগত ইখতেলাফকে দূরে ঠেলে উম্মতে মুসলিমাহর সবদলকে জড়ো করে সবচেয়ে বড় শত্রু আমেরিকা ও ইসরাইল এবং তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, অত্যাচারী কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উপর গুরুত্ব দেয় এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন ও নবুওতের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়। এই মানহাজ আমাদের উস্তাদ

আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ জিহাদি শায়খদের কাছ থেকে শিখেছেন, এটাকে শরীয়াহের মনে জেনেছেন এবং উম্মতে মুসলিমার একমাত্র উপায় হিসেবে পেয়েছেন, এবং শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর দল আল-কায়েদার এই পবিত্র জিহাদি দৃষ্টিভঙ্গির খেদমত, নিজের জাতিকে এরদিকে একত্র করা এবং এর ভিত্তির উপর জিহাদি আন্দোলনকে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন।

উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ পিছনের সমস্ত বছর ধরে আল-কায়েদার শায়খদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের মধ্যে দাওয়াহ বিভাগের দায়িত্বের উপর নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এই সময়ে পাকিস্তানের ভেতর শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহের জিহাদের দাওয়াতের পূর্ণ মুখপাত্রের ভূমিকায় ছিলেন, এই পথেই সাথীদেরকে দীক্ষা দেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পাকিস্তানবাসীকে আহবান করেছেন। আল-কায়েদার খোরাসানের দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহের শাহাদতের পর তাঁর স্থলে গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। জিহাদের ময়দানে থেকে তিনি যেখানে জিহাদ ও মুজাহিদদের সম্পর্কিত প্রশাসনিক, সামরিক, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য ব্যস্ততায় নিয়োজিত ছিলেন, সেখানে সাথে সাথে তিনি শিক্ষকতা ও রচনা, আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পরিশোধন, বিবৃতি ও নির্দেশনা, প্রচার-প্রসারে ব্যাপক মনোযোগ ও সময় দিতেন।

পাকিস্তানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা রাষ্ট্র ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতালের বলিষ্ট দায়ী ও উদ্যমী নেতা ছিলেন। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানে জিহাদের ঘোষণা করলেন এবং আল-কায়েদা এই জিহাদে পা রাখলো। তখন তাঁর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্ত বানিয়ে তাদের সৈন্য এবং গোপন এজেন্সীসমূহে অনেক সফল অপারেশন পরিচালিত হয়। পাকিস্তানের মধ্যে এবং তার চেয়ে অগ্রসর হয়ে নিখিল ভারতে আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রাণিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো। এই দলের প্রতিষ্ঠার সময় তিনি নিজের পূর্বের দল বিলুপ্ত করেন এবং অত্যন্ত প্রশান্ত ও প্রসন্ন হৃদয়ে মুহতারাম আমীর মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহের হাতে বাইয়াহ দেন। মাওলানা হাফিজাহুল্লাহ তাঁকে নিজের নায়েবে আমীর এবং দাওয়াহ বিভাগের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করেন। তিনি নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন।

দায়িত্বশীলতারই এমন অনুভূতি ছিলো যে, তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে যুদ্ধের এলাকা এবং অবরোধ থেকে বের হওয়ার মধ্যে নিজের উপর অন্যান্য মুজাহিদদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন সাথীদেরকে বের করতে গেলেন এবং নিজে তাদেরকে বের করার মধ্যে দেরী করতে লাগলেন, এমনকি যখন আমি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে চিঠি দিলাম এবং তাড়াতাড়ি বের হতে খুব নিবেদন করলাম, বের হওয়ার বিভিন্ন রাস্তা ও ধারাবাহিকতাও আমি সামনে তুলে ধরলাম, তখন জবাবে আমাকে এই কবিতা লিখে পাঠালেন, যে, (অর্থ) 'যখন আমার জীবনে মৃত্যু একবারই আসবে = তাহলে কেনো এটা শাহাদতের মাধ্যমে হয় না'?

পাকিস্তানকে আমেরিকার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের মধ্যে শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তবায়ন উস্তাদ আহমদ ফারূকের স্বপ্ন ছিলো। পাকিস্তানের জিহাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং এটাকে শরীয়তের মোতাবেক দেখা, তাঁর এমন আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, এরজন্যে তিনি সর্বদা চিন্তিত ও বিমর্ষ থাকতেন। পাকিস্তানের মধ্যে জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত দেখা, জুলুম ও কুফরের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই মুবারক জিহাদকে সর্বদা অব্যাহত রাখা, এই জিহাদকে শরীয়তের ভিত্তির উপর সামনে নিয়ে চলা এবং অগ্রসর করার এই পরিমাণ উদগ্র বাসনা ছিলো যে, শাহাদতের দু'দিন পূর্বেও এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে চিঠি প্রেরণ করেছেন এবং সাথে অডিওবার্তাও রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন। এই চিঠি ও বার্তা এমন সময় তিনি প্রস্তুত করেছেন, যখন তাঁর শাহাদতের প্রায় আশা হয়ে গিয়েছিলো, শত্রুদের প্রচন্ড অবরোধ ছিলো, এবং তাঁকে লক্ষ্য বানানোর জন্যে চল্লিশ দিন ধরে পাঁচ ড্রোনও মাথার উপর ছিলো। কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তেও কুফরি শাসনব্যবস্থার অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত রাখা এবং পাকিস্তানের বরকতময় কাফেলাকে সর্ববস্থায় সামনে অগ্রসর করার ওসিয়ত দিয়েছেন। এই ওসিয়তে পাকিস্তানের জিহাদে নিয়োজিত সব মুজাহিদদেরকে এই জিহাদকে শরয়ী জিহাদের উপর চলা, শরীয়াহ বহির্ভূত কাজের উপর নীরব না থাকা এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যে প্রশান্তি এবং রহমত বানানোর জন্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জোর দিয়েছেন। জিহাদকে সঠিক রেখার উপর পরিচালনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাকুলতাকে দেখুন, দীর্ঘ অবরোধের মধ্যেও

শেষদিনগুলোতে যখন ডানেবামে শাহাদত এবং গ্রেফতারির সংবাদ আসছিলো, শত্রু মাথার উপর ছিলো, শাহাদত নিশ্চিত ছিলো, এই কঠিন মুহূর্তে 'ফুরসান তাহতা রায়াতিন ন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' [নবীসাল্লাল্লাহু পতাকাতলের অশ্বারোহী] গ্রন্থের অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। মুহতারাম আমীর শায়খ আইমান হাফিজাহুল্লাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যেখানে তিনি অর্ধ শতাব্দির জিহাদি ইতিহাস, এগুলোর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসমূহের গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং এগুলোর আলোকে আগামী জিহাদি আন্দোলনের নির্দেশনা, শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত অনন্য সঙ্কলন। নিজের শেষদিনগুলোতে উস্তাদ আহমদ ফারূক রাহিমাহুল্লাহ বার বার বলতেন, যে, বর্তমান জিহাদ বিশেষভাবে পাকিস্তানের জিহাদের জন্যে এই পাঠ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ খুবই আবশ্যক। লিখিত অনুবাদ অনেক সময় খেয়ে ফেলে, তাই তিনি ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে অনুবাদ ও পর্যালোচনা রেকর্ড করলেন এবং অধিকাংশের অনুবাদ করে শাহাদতের দু'দিন পূর্বে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁর এই উদগ্র বাসনা এবং জিহাদের রাস্তার ভালবাসাকে কবুল করুন। আমীন।

তিনি প্রত্যেক ধরনের মসলকী ও সাংগঠনিক উগ্রতা থেকে দূরে থাকতেন। শাখাগত মতানৈক্যের ভিত্তির উপর পৃথক থাকা এবং অন্যকে দূরে ঠেলে দেওয়ার বিপরীতে নিকটবর্তী হওয়া ও নিকটবর্তী করার ক্ষেত্রে, পরস্পরে মিলেমিশে থাকা এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সাহায্যের পরিবেশ তৈরী করা ছিলো তাঁর উজ্জ্বল গুণ। সাংগঠনিক এবং দলগত সংকীর্ণতা থেকে সরে সব জিহাদী দলসমূহের মুজাহিদ এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ভালবাসা রাখতেন, সবার ব্যথায় ব্যথিত এবং আনন্দে আনন্দিত হতেন। তেহরীকে তালেবানের আমীরদের সাথে স্বতন্ত্র সম্পর্কের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতেন এবং পাকিস্তানের জিহাদের শক্তিবর্ধন ও সংশোধনের জন্যে কখনোসখনো কাজ ও পরামর্শকে নিজের জন্যে সৌভাগ্য মনে করতেন।

আল্লাহ তাঁর এই পবিত্র আশাকে কবুল করুন এবং পাকিস্তানে লড়াইরত মুজাহিদদেরকে শরীয়তের উপর চলার তাওফীক দিন, তাঁদের অন্তরকে সত্যের উপর অটুট রাখুন। আল্লাহ পাকিস্তানের জিহাদকে খুব উন্নতি দান করুন এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যে রহমত বানান। পাকিস্তান এবং এই নিখিল ভারত উপমহাদেশে দীনের শত্রু এবং আমেরিকার দাসদেরকে নিজের

বিশেষ রহমত দ্বারা, এই পবিত্রাত্মার মুজাহিদদের রক্তের বরকতে আমাদের হাতে সুস্পষ্ট পরাজয় দিন এবং এই পূর্ণভূমিতে ইসলামের জয়জয়কার করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫২১

আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি

Mutmain

Junior Member

১২-২৭-২০১৫

১১সেপ্টম্বরের হামলার পর আমেরিকা আল-কায়েদার সন্দেহভাজন যে কয়েকজন সদস্যের নাম প্রকাশ করেছিলো এদের মধ্যে প্রথম নাম হচ্ছে শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ'র, দ্বিতীয় নাম হচ্ছে আমীরুল মুজাহিদীন হাকীমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ। যাঁকে আল-কায়েদার মগজ বলা হয়। শায়খ আইমান হাফিজাহুল্লাহের ব্যাপারে খু-ব-ই কমই প্রকাশিত হয়েছে এজন্যে লোকেরা কম জানে। প্রখর মেধা, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার জন্যে মুজাহিদদের মধ্যে হাকীমুল উম্মাহ (উম্মতের চিকিৎসক) উপাধিতে প্রসিদ্ধ। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহে'র ডানহাত এবং আল-কায়েদার নীতি নির্ধারক হিসেবে প্রসিদ্ধ।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ তিনি আবু আব্দুর রাহমান আইমান বিন মুহাম্মদ আজ-জাওয়হিরি ১৫ রমজান ১৩৭০ হিজরি মোতাবেক ১৯৫১ সালে কায়রোর মুয়াদী এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁর দাদা জাওয়াহিরি জামেয়া আজহারের একজন শায়খ ছিলেন। নানা ডাক্তার আব্দুল ওয়াহহাব আযযাম ছিলেন আদাবে শারকিয়্যাহের শিক্ষক, সাহিত্য কলেজের অধ্যক্ষ এবং কায়রো ইউনিভার্সিটির প্রধান। তিনিই আল্লামা ইকবালের কবিতাকে আরবিতে রূপান্তর করেন, আরবি কবি মুতানাব্বীর কবিতার ব্যাখ্যাসহ আরো অনেক গ্রন্থের রচয়িতা।

তাঁর পিতা মুহাম্মদ রাবে' আজ-জাওয়াহিরি ছিলেন আইনে শামস ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা কলেজের শিক্ষক এবং মিশরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার।

তাঁর মামা সালিম আযযাম ছিলেন ইউরোপ ইসলামিক বোর্ডের সেক্রেটারি, অন্য মামা মাহফুজ আযযাম মিশরের শ্রমপার্টির প্রধান।

শায়খের শৈশব বেড়ে ওঠে একটি ইসলামি পরিবেশে, বাল্যকাল থেকেই তিনি মসজিদে সালাত আদায়ে আগ্রহী ছিলেন, বিভিন্ন দারস ও ইলমি হালকায়ে উপস্থিত হতেন, পড়ালেখায় মনোযোগী, খেলাধুলা ও বন্ধুদের থেকে দূরে থাকতেন।

শিক্ষাদীক্ষাঃ শায়খা হানী আস-সিবায়ী হাফিজাহুল্লাহ বলেন, 'ডাক্তার আইমান আনসারদের আসারুস-সুন্নাহ মসজিদে যাতায়াত করতেন, সেখানে তাঁর সাথীদের সাথে মিলতেন, দ্বীনি দারস শুনতেন এবং তাজবীদের হালকাতে উপস্থিত হতেন, এটাই ছিলো তাঁর সূচনা; কোনো কোনো হালকাতে কুরআন শরীফ পড়া হত, কোনো কোনো হালকাতে বিভিন্ন শায়খদের কাছ থেকে তাজবীদ শিখা হতো। এরপর তিনি ভাইদেরকে কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। অতঃপর তাফসীর পড়া শুরু করেন এবং মাকতাবায়ে সালাফিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত কিতাবাদি অধ্যয়ন শুরু করেন'।

প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁর পড়ালেখা একটি সরকারী স্কুল থেকে শুরু হয়। এরপর তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাসরে আইনীতে ভর্তি হন, সেখান থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বের হন। এরপর মাস্টার্স সমাপ্ত করে পাকিস্তানের একটি ইউনিভার্সিটি থেকে সার্জারীতে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পরিবার একটি ডাক্তার পরিবার হিসেবে প্রসিদ্ধ। শুধু তাঁর বংশেই আছেন ৪০জন ডাক্তার।

ইসলামি আন্দোলন ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহঃ শায়খ নিজে তাঁর ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, 'ইসলামি আন্দোলনে আমার সূচনা হয় এই জামাআতুল জিহাদ দ্বারা, তখন ছিলো ১৯৬৬ সাল, সায়্যিদ কুতুব শহীদ রাহ'র হত্যার পর এই দলের জন্ম হয়। ১৯৮০ সালের শেষদিকে ১৯৮১ সালের শুরুর দিকে আমি আফগানিস্তানে সেখানকার পরিস্থিতি কাছ থেকে দেখার জন্যে সফর করি'।

আফগান থেকে ফেরার পর ১৯৮১ সালের শেষদিকে শায়খকে মিসরের ফেরআউন ইসরাইলের রক্ষক আমেরিকার গোলাম আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করার অভিযোগে তাঁর দল জামায়াতুল জিহাদকে সন্দেহ করে শায়খকে গ্রেফতার করা হয়। লাগাতার ৩ বছর কারাগারে বন্দী থাকার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই তিন বছর গভীরভাবে ইসলামি পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে চলমান ইসলামি আন্দোলনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর সৌদী আরবে চলে যান,

সেখান থেকে পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে তিনি একটি ক্লিনিক খুলেন, যেথায় আফগান মুহাজিরদেরকে ফ্রী চিকিৎসা সাল্লাম দিতে থাকেন। এখানেই প্রথমে পরিচিত হন শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে। এরপর আফগান জিহাদে শরীক হন।

এ ব্যাপারে শায়খ নিজে বলেন, 'জেল থেকে মুক্তির পর আমি ভাইদেরকে নতুনভাবে জড়ো করা শুরু করি, আমরা সিদ্ধান্ত নেই আফগান রণাঙ্গনকে ট্রেনিংয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে। আল্লাহ এব্যাপারে আমাদেরকে অনেক তাওফিক দেন'।

শায়খের সংক্ষিপ্ত জীবনরেখা

-• ১৪০৫ হিজরি (১৯৮৫ সাল) শায়খ পাকিস্তানের আফগান সীমান্তে আহতদের চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকেন।

• ১৪১৩ হিজরি (১৯৯২ সাল) শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাথে সুদান হিজরত করেন।

• ১৪১৬ হিজরি(১৯৯৬ সাল) আফগানিস্তানে তালেবান আধিপত্যের পর ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ ঘোষণার পর হিজরত করেন।

• ১৪১৮ হিজরি (১৯৯৮ সাল) তিনি নিজের দল তানযীমে জিহাদ বিলুপ্ত করে শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহের নেতৃত্বে অন্যান্য দলের সমন্বয়ে 'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ লিক্বিতালিল ইয়াহুদ ওয়াসসাসালিবিয়্যীন' (ইয়াহুদী-ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জিহাদি ইসলামিক ফ্রন্ট) প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে আল-কায়েদা নামে পরিচিত।

শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহের শাহাদতের পর তিনিই বর্তমানে আমাদের আমীরুল মুজাহিদীনের ভুমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ শায়খের হায়াত বৃদ্ধি করুন। শায়খকে হেফাজত করুন। আমীন।

শায়খের রচনাবলীঃ

• ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝান্ডাতলের অশ্বারোহী)ঃ ৭০০এর অধিক পৃষ্ঠার আরবি গ্রন্থ। যেখানে শায়খ বিগত ৫০ বছরের বিভিন্ন ইসলামি, জিহাদি দল

ও সংগঠনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আত্মজীবনী আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

• আস-সুবহু ওয়াল ক্বিনদীল (প্রভাত এবং নিভু নিভু প্রদীপ)ঃ পাকিস্তানের সংবিধানকে যারা শরীয়াহ সংবিধান বলেন তাদের জবাবে একটি ইলমি আলোচনা।

• আল-হাসান আলাইহি ওয়া সাল্লামদুল মুর... ইখওয়ানুল মুসলিমীন ফী সিত্তীনা আমান (তিক্ত অর্জনঃ মুসলিম ব্রাদারহুডের ষাট বছর)ঃ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে লিখা।

•এছাড়া রয়েছে ছোট ছোট বার্তা ও পুস্তিকা। যেমন- নিশ্চয় ফিলিস্তিন আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলমানদের ইস্যু, ত্বাওয়াগীতদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে কথোপকথন, কুদসের পথ কায়রো হয়ে অতিক্রম করবে, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, কুরআনের ঝান্ডাতলে মানুষ ও ভূমির মুক্তি, মুসলমানদের মিসর জল্লাদদের চাবুক এবং গাদ্দার দোসদের হাতে ইত্যাদি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫২০

মোল্লা মুহাম্মাদ উমার হাফিযাহুল্লাহ্ঃ

GreenBird

Junior Member

০৪-০৬-২০১৫

নিষিদ্ধ সাক্ষাৎকারঃ মোল্লা মুহাম্মাদ উমার হাফিযাহুল্লাহ্ঃ আমি দুটি প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করিঃ একটি আল্লাহর, অন্যটি বুশের...

(ভয়েস অব এমেরিকার একজন সাংবাদিক ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্থানের আমির মোল্লা মুহাম্মাদ উমার হাফিযাহুল্লাহর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন এবং এমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট ২০০১ সালের ২২, সেপ্টেম্বর এটার প্রচারনা নিষিদ্ধ করে। এরপরও, ভয়েস অব এমেরিকা কাটছাট করে ১৫০ টি শব্দ রেখে সাক্ষাতকারটি সম্প্রচার করে। anews সাক্ষাৎকারটির পুর্ন বক্তব্য প্রকাশ করেছে)

প্রশ্নঃ আপনি কেন উসামা বিন লাদেনকে বহিষ্কার করছেন না?

মোল্লা উমারঃ এটা উসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় না। এটা ইসলামের একটা বিষয়। ইসলামের মর্যাদা আজ হুমকির মুখে। হুমকির মুখে আফগানিস্তানের ঐতিহ্যও।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে?

মোল্লা উমারঃ আমি দুটি প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করছিঃ একটি হচ্ছে আল্লাহ্*র প্রতিশ্রুতি, আর অন্যটি হচ্ছে বুশের। আল্লাহ্*র প্রতিশ্রুতি হচ্ছে যে আমার ভুমি বিস্তৃত। যদি তুমি আল্লাহ্*র পথে চলা শুরু কর তবে তুমি পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বসবাস করতে পারবে এবং সুরক্ষিত থাকবে। অপরদিকের বুশের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নাই যেখানে তুমি লুকাতে পার যে আমি খুঁজে পাব না। আমরা দেখব এই দুটি প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনটা পরিপূর্ণ হয়।

প্রশ্নঃ কিন্তু আপনি কি জনগনের, নিজের, তালিবানদের ও দেশের ব্যাপারে ভীত নন?

মোল্লা উমারঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ...মুমিন এবং মুসলিমদের সাহায্য করছেন।

আল্লাহ বলেন তিনি কখনো কাফিরদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। পার্থিব দিক বিবেচনায় এমেরিকা খুবই শক্তিশালী। এমনকি এটা যদি আরও দিগুন শক্তিশালী হত অথবা তার চেয়েও আরও দিগুন তারপরেও (আমি বলব) তারা আমদেরকে পরাজিত করার মত শক্তিশালী হতে পারবে না। আমরা কনফিডেন্ট যে আল্লাহ যদি আমাদের সাথে থাকেন তবে কেউ আমাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ আপনি আমাকে বলছেন যে আপনি এই ব্যাপারে মোটেও উদ্বিগ্ন না, কিন্তু বিশ্বব্যাপী আফগানরা তো উদ্বিগ্ন?

মোল্লা উমারঃ আমরাও উদ্বিগ্ন। বিরাট বিরাট ইস্যু সামনে রয়েছে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্*র দয়ার উপর ভরসা করি। এটা মনে হতে পারে যে আমাদের নিকট সত্য মুহুর্তটি এসে গেছে, কিন্তু আল্লাহ্*র অনুগ্রহ রয়েছে মুসলিমদের সাথে।আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করুনঃ আমরা যদি আজকে উসামাকে দিয়ে দেই, তবে সে সকল মুসলিম যারা আজ তাকে পরিত্যাগ করতে বলছে তখন তারাই আবার তাকে ত্যাগ করার কারণে আমাদের নিন্দা করবেঃ কেন তোমরা ইসলামের মর্যাদার ক্ষতি সাধন করলে, কেন তোমরা মুসলিমদের উপর লজ্জা বয়ে আনলে?

প্রত্যেকে এমেরিকাকে ভয় করে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু আমাকে বলতে দিনঃ এমেরিকা এই ধরনের কর্মকান্ড প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না যা অতি সম্প্রতি ঘটে গেল। কারন আমেরিকা ইসলামকে জিম্মি রুপে গ্রহন করেছে। আর এমেরিকা এটা ইসলামি বিশ্বেই করছে, বিশেষত ইসলামি দেশগুলোতে।

যদি আপনি ইসলামি দেশগুলোর দিকে তাকান, দেখবেন যে লোকজণ হতাশাগ্রস্ত। তারা অভিযোগ করছে যে ইসলাম আজ সর্বস্বান্ত। ধর্ম নিরপেক্ষ আইন আজ ইসলামিক আইনের জায়গা দখল করেছে। কিন্তু জনগন তাদের ইসলামি বিশ্বাসে স্থির আছে। দুঃখ এবং হতাশায় তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করে। তারা অনুভব করে যে তাদের হারানোর মত আর কিছু বাকি নাই। যদি এমেরিকা সত্যিকার অর্থে এই বিপদ মিটাতে চায়, তার জানা উচিত তাকে কি করতে হবে। তাকে ইসলামের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। ইসলাম কে তার নিজের মত করে চলতে দিতে হবে। এবং তার পরেই মুক্তি আসবে এবং প্রত্যেকে তার নিজের কাজ করতে পারবে।

প্রশ্নঃ আপনি এটা দ্বারা কি বুঝাতে চান যে এমেরিকা ইসলামি বিশ্ব কে জিম্মি রুপে গ্রহন করেছে?

মোল্লা উমারঃ এমেরিকা ইসলামি দেশগুলোর সরকার নিয়ন্ত্রন করে। এমেরিকা তাদের তত্বাবধান করে যাতে করে তারা তার চাহিদা পূরণ করে। এ ধরনের একটি সরকার তার নিজের জনগনের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। জনগন তাদেরকে ইসলাম অনুসরনের কথা বলে, কিন্তু সরকার তা শুনে না কারন তারা এমেরিকার কব্জায়। জনগন তাদের নিজেদের সরকারের উপর ক্ষমতাহীন কারন এই সরকারগুলো এমেরিকার হাতে। তাই সরকার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে পড়ে এবং সে তার জনগনকে ভুলে যেতে শুরু করে।

যদি কেউ ইসলামের পথ অনুসরন করে তবে সরকার তাকে গ্রেফতার করে, তাকে নির্যাতন করে অথবা হত্যা করে। এগুলো হচ্ছে এমেরিকার কাজ। যদি সে (এমেরিকা) এসকল সরকারকে সাহায্য করা বন্ধ করে এবং জনগনকে তাদের সাথে বুঝাপড়া করতে দেয়, তখন এধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। এমেরিকা নিজেই বিপদের সৃষ্টি করেছে যা এখন তাকে আক্রমন করছে। এই বিপদ শেষ হবে না এমনকি যদি আমি মরে যাই, উসামা মরে যায়, এবং অন্যরা মরে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ পিছনে ফিরে গিয়ে পুনরায় তার নীতি পরিক্ষা করা। তার উচিৎ বিশ্ব জুড়ে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাদ দেয়া, বিশেষ করে মুসলিম দেশ গুলোতে।

মানবিক সাহায্যর নামে এমেরিকা আফগানিস্থানে হাজার হাজার বাইবেল এনেছিল এবং খ্রিস্টবাদকে উৎসাহিত করেছিল। যদি তারা এখানেই তা করার ধৃষ্টতা দেখায়, চিন্তা করুন আরব দেশগুলোতে তারা কি করে, মুসলিমরা এটা বুঝে। এবং তারা এটাও জানে যে তারা কোন কিছু করতে অক্ষম...একারণে আত্মঘাতী আক্রমন করে তারা নিজেদেরকেই হত্যা করছে। তারা এই পৃথিবীতে আর বেচে থাকতে চায় না।

প্রশ্নঃ তাই আপনি উসামা বিন লাদেন কে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিবেন না?

মোল্লা উমারঃ না, আমরা এটা করতে পারি না। যদি আমরা তা করতাম তবে এর অর্থ দাড়াতঃ আমরা মুসলিম না... যে ইসলাম খতম হয়ে গেছে। যদি আমরা

আক্রমনের ভয় করতাম, তবে আমরা তাকে তখনই সমর্পন করতে পারতাম সর্বশেষ যখন আমাদেরকে হুমকি দেয়া এবং আক্রমন করা হয়েছিল।

প্রশ্নঃ যদি আপনি আপনার সর্বশক্তি দিয়ে এমেরিকার সাথে যুদ্ধ করেন...তালিবান কি সেটা করতে পারবে? এমেরিকা কি আপনাদের ধ্বংস করে দিবে না এবং আপনার জনগন কি আরও বেশি দুর্ভোগ পোহাবে না?

মোল্লা উমারঃ আমি অত্যান্ত আত্মবিশ্বাসী যে ব্যাপারগুলো এমন হবে না। দয়া করে নোট রাখুনঃ আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্*র উপর ভরসা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না। যদি কেউ এটা করে তবে সে এই নিশ্চয়তা পাবে যে সর্বশক্তিমান তাকে সাহায্য করবেন, তার প্রতি দয়া করবেন এবং সে সফল হবে।

উৎসঃ ভয়েস অব এমেরিকা

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩

আসিম আল মাকদিসির (দা.বা.) জীবনি

power

Senior Member

০৯-০১-২০১৫

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসির (দা.বা.) সাক্ষাতকার এবং তাঁর জীবনি"

এনএম: দয়া করে কি আমদের পাঠকদের সামনে আপনার পরিচয় তুলে ধরবেন?

শায়খ: সমস্ত প্রশংসার আল্লাহর যিনি প্রশংসার উপযুক্ত। দুরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং যারা তাকে সাহায্য করে তাদের উপর।

১৩৭৮ হিজরীতে (১৯৫৯ ইংরেজী) ফিলিস্তিনের নাবলুসে আমার জন্ম। যখন আমার বয়স ৩ অথবা ৪ হবে সে শহর ছেড়ে আমি আমার পরিবারের সাথে কুয়েতে স্থায়ি হই, এবং এখানেই হাই স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করি। আমার লক্ষ্য ছিল মদিনার ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করার, কিন্তু আমার পিতা মাতাকে খুশি করতে এরপর আমি নর্দান ইরাকের মসুল ইউনিভার্সিটিতে সাইন্স পড়তে চলে যাই। এটা সেই সময়ের কথা যখন আমি ইসলামের ব্যাপারে আমার প্রবল আগ্রহ/ চেতনা খুঁজে পাই এবং অনেক গ্রুপের সাথেও আমার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আমি ভুলতে পারব না সেসব ভাই শায়খদের সাহায্যের কথা। আমি কুয়েত ও হিজাজে সফর করেছি যেখানে শিক্ষাবিদ ও শায়খদের সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল যারা আমাকে ইসলামিক জ্ঞান আহরণের মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। যাইহোক, তারা আমার পিপাসার্ত প্রশমিত করতে পারলেন না সেসব প্রশ্নের ব্যাপারে যা মুসলিম যুবকদের চাহিদা, যেমন সঠিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিজ্ঞান, কিভাবে সঠিক লিগ্যাল রুলিং বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্টা করতে হবে, আমাদের সময়ের শাসকদের ব্যাপারে আমাদের সত্যিকার অবস্থান কি, এবং সঠিক পথের দিশা যা উম্মাহর বর্তমান বাস্তবতার পরিবর্তন আনবে ইত্যাদি। একারণে, আমি একনিষ্ঠতার সাথে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিমের বই পড়তে নিমগ্ন হই। উপরন্তু, আমার মদীনায় সফরের সময়ে আমি অনুরাগী হয়ে যাই মোহাম্মাদ ইবনে

আবদুল ওয়াহহাবের বই, তার ছাত্র, ছেলে ও নাতীদের প্রতি এবং নাজদি দাওয়াহর ইমামদের প্রতি, যা সেখানকার পাবলিক ও প্রাইভেট লাইব্রেরীগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব বইয়ের স্টাডিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করি। পরবর্তীকালে আমার পথ চলায় এসব বইয়ের ভীষণ প্রভাব ছিল। আমি পাকিস্থান ও আফগানিস্তানেও সফর করেছি এবং সেখানে আমি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুসলিম ভাই ও ইসলামিক গ্রুপের সাথে মিলিত হই। আমি সেখানে কিছু শিক্ষামূলক ও দাওয়াহ কাজে জড়িত ছিলাম। সেখানে অবস্থানকালে "মিল্লাতে ইবরাহীম" একটি বই রচনা করি।

এছড়া মুকাফফিরাদের সাথেও আমার বিতর্ক হয় যার ফলে কিছু পান্ডুলিপির সংকলন হয় যা এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। কিছু ইরজায়ী দলের সাথেও আমার বিতর্ক ও মোকাবিলা হয়েছে, যার ফলে কিছু বই বেরিয়ে এসেছে যেমন "Delighting the Sight with Unveiling the Scepticism of Contemporary Murji'at".

ফাইনালি আমি ১৯৯২ সালে জর্ডানে সেটেল হই, তা ছিল আমার গ্রেফতারির দুই বছর পূর্বে। আমি দেখলাম এদেশ ইরজায়ী লোকে কিলবিল করছে যারা আনন্দের সাথে এর উপর প্রলাপ বকে যাচ্ছে। তিনটি ভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার মাধ্যমে আমি এ পবিত্র দাওয়াহ শুরু করি। দুটি ছিল সর্বসাধারণে ও একটি খাস। পাঠে গুরুত্ত দেওয়া হয় তাওহীদের ধারণা, তার তাৎপর্য ও বাধ্যবাধকতা উপর; লা ইলাহা ইইল্লাল্লাহকে তার শর্তের সাথে – যেমন কিসে তা বাতিল করে ও কি তার শক্তিশালী অংগীকার। পাঠে ইরজায়ী গ্রুপেরও মোকাবিলা করা হয় তাদের উপস্থাপিত সংশয়বাদকে খন্ডণ করার মাধ্যমে। এছাড়া আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক মানুষ যে ব্যাপারে অজ্ঞ। এসব পাঠ আইন-পরিষদের নির্বাচনের সময় দেয়া হচ্ছিল। সুতরাং, আমার ছাত্র এবং গণতন্ত্র ও ইলেকশানের সমর্থকদের মধ্যে বিতর্ক জ্বলে উঠল। প্রয়োজন ছিল এ ইস্যুকে স্পষ্ট করার। আর তাই এ বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখে ঐ লোকদের দ্বারা উপস্থাপিত অত্যন্ত সুপরিচিত সন্দেহের খন্ডণে আমি উদ্যেগী হলাম। তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরি ঐ প্রবন্ধের নাম দিলাম "ডেমোক্রেসি একটি ধর্ম, আর কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম খুঁজে তা কখনো আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হবে না"। এই প্রবন্ধ প্রিন্ট করে আমরা তা বিলি করতে থাকি। তাছাড়া আমি একটি জুম'য়া খুতবায় তাওহীদের দাওয়াহর নিয়ে ব্যাখ্যা করলাম,

এবং তাতে মানুষকে সরাসরি আহবান করলাম মানব তৈরি আইনের সমালোচনা করতে, আইন পরিষদকে অস্বীকার করতে ও তাতে অংশ না নিতে।

আমি ব্যগ্র ছিলাম আমাদের দাওয়াহকে ছড়িয়ে দিতে, তাই আমি ও সাথি ভাইয়েরা দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিনাঞ্চলে প্রচুর সফর করলাম। কিছু ভাই যারা আফগান জিহাদে শরীক হয়েছিলেন তাদের সাথেও দেখা করলাম, আর ভালো দাওয়ার কাজও হয়ে গিয়েছিল। আমাদের রচসা'সমূহ তাদেরকে দিলাম এবং আহবান করলাম বেরিয়ে এসে দাওয়ার কাজে জোর দিতে। এই দাওয়ার বয়স নতুন হওয়ার পরও তা সিকিউরিটি অফিসারদের নজর কাড়ল। তাছাড়া এই দাওয়াহ ইরজায়ী দলগুলো ও সরকারী অফিসারদের জন্যও অসহ্য হয়ে দাড়াল। তাই প্রত্যেক দলই এই দাওয়াহর মোকাবেলা করতে লাগল ধূর্ততার সাথে। সরকারী কর্মচারীরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দাওয়াহর ইমেজকে বিকৃত করতে নিয়োজিত হল। তারা আমাদের ভাইদেরকে বিভিন্ন খেতাবে অভিযুক্ত করতে লাগল যেমন 'তাকফিরি' বা 'চরমপন্থি' ইত্যাদি, যা সাধারণত সত্যপন্থীদেরকে অবমাননা করতে ইরজায়ীরা গ্রুপরা ব্যবহার করে থাকে।

এরপর গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের ভাইদের একে একে গ্রেফতার করা শুরু করল। তারা জিজ্ঞেস করত আমাদের দাওয়াহর ব্যাপারে, আমার ব্যাপারে, আমার দেয়া পাঠদানের পদ্ধতি সম্পর্কে এবং আমি কোন আদর্শের দাওয়াত দিচ্ছি তার ব্যাপারে। এসব ঘটনা আমার জন্য স্বাভাবিক ছিল এমনকি আমি আশা ও অপেক্ষা করছিলাম যে, যে কোন সময় তা ঘটতে পারে যেহেতু এই পথের প্রকৃতিই এটা। আল্লাহর শত্রুরা যে কোন দল বা অর্গানাইজেশনকে মেনে নিতে পারে যে পর্যন্ত না তারা ইরজায়ী মতের উপর থাকে, তাই তারা গ্রেফতারকৃত আমাদের কিছু ভাইদের জিজ্ঞেস করত: "তোমরা যা শিখার তা আলি আল-হালাবী, আবু শাকরাহ অথবা আল-আলবানী ও অন্যান্যদের কাছ থেকে কেন শিখ না? এসব শায়খদের তোমরা কি এক সন্ত্রাসীর জন্য পরিত্যাগ করছ?"

এমন দাওয়াহ যা রাসূলদের পথ অনুসরণ করে, ইবরাহীমের ধর্মমতের উপর প্রতিষ্টিত হয় এবং তাওহীদকে তুলে ধরে তা কখনো একাকী ছেড়ে দেওয়া হয় না। আর এ দাবির স্বীকৃতি দেয় নবুওয়াতের শুরুর সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. কে বলা ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের উক্তি: "আপনার পুর্বের কোন ব্যক্তিই

(ie. রাসূল) বহন করেননি (ওহী) বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া ও শত্রু হিসেবেই তাদের সাথে আচরণ করা হয়েছে।" অতএব, যার আল্লাহর শত্রুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না, সে আসলে প্রকৃত বাণী বহন করছে না এবং অবশ্যই তার মাঝে নির্দিষ্ট কিছুর ঘাটতি, বিচ্যুতি অথবা পথভ্রষ্টতা রয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে, আমাদের দাওয়াহর মত দাওয়াহ এদেশে এখনও শিশুকালে রয়েছে; এটাকে আরো গবেষণার প্রয়োজন এবং এটাকে আরো জোরদার ও উন্নত করবে এর সংস্কার এবং এটাকে স্থির করবে পবিত্রতাকে নিয়ে এসে অপবিত্রতাকে পৃথক করার মাধ্যমে।

আমি ও আমার সাথীরা আত্মসমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সাত সাতবার আমার ঘর ভাংগা হয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। দরজা ভেংগে আমার ঘর সার্চ করা হয়, প্রচুর বই, ডকুমেন্ট, লেখা এবং যা কিছু তাদের সামনে আসে ক্রোক করা হয়। প্রত্যেক রেইডে, তারা ডিমান্ড করত আমি যেন এসে ধরা দেই।

অবশেষে, আমি একদল ভাইয়ের সাথে গ্রেফতার হই, এদের মধ্যে কিছু ভাই পূর্বে আমার কাছে ফতোয়া চেয়েছিল নদী অতিক্রম করে (প্যালেষ্টাইনে) এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের মাধ্যমে গোপন অপারেশ করার জন্য যা আমি তাদের করতে দেইনি। যদিও আমি এসব অপারেশনের বিরোধী নই তবুও আমি বলি বর্তমান অবস্থায় তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, ধৈর্য ধরা এবং এজন্য সংগ্রাম করে যাওয়া এদেশের জন্য বেশি উপযুক্ত। এর কারণ হল যে এধরনের অপারেশনের (ইহুদীদের বিরুদ্ধে) প্রচুর সমর্থক রয়েছে, বিশেষ করে এদেশে, ফিলিস্তিনের সাথে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে। পক্ষান্তরে যারা কুফরের ইমামদের সাথে অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে তাদের মাঝে তাওহীদের দাওয়াহর সমর্থক অত্যন্ত কম। বাস্তবতা হল এই বিশ্বাসঘাতকরা 'ইসরাঈলে' ও যারা তা রোপণ করেছে মুসলিম বিশ্বের বুকের মধ্যে তাদের গার্ড, আর তারা পূর্ব ও পশ্চিমের কুফফারদের জন্য সম্ভবপর করেছে আমাদের সম্পদ ও সৌভাগ্য শুষে নিতে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশ করেছেন:

তারা তার ক্ষতি করতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম। (২১:৭০)

এই গ্রেফতারীর কারণে এবং আল্লাহর শত্রুরা এ ইস্যুকে ষড়যন্ত্র করে বড় করে দেখানোয়, তাদের মিডিয়া ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হইচই ফেলে দেয়ায়, তা আল্লাহর রহমতে আমাদের দাওয়াহকে দ্রুততার সাথে প্রকাশ ও প্রসারের সাহায্য করল। নিশ্চয়ই, খারাপ সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক ভালো সাহায্য প্রকাশ পায় যা সাধারন অবস্থায় প্রকাশিত হয় না। আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের অন্তরকে গ্রেফাতারীর শুরু থেকেই অবিচল রেখেছেন। আমরা তাগুত ও তাদের আইনের প্রতি নিজেদের নিষ্কলুষতা ঘোষণা করলাম, কোন ধরনের মোসাহেবি ও চতুরতা ছাড়াই। জেলে ও কোর্টরুমে আমাদের অবস্থান ভালো হতে লাগল নিয়মিত খোতবা, লেখা ও পাঠদানের মাধ্যমে যা কার্যকরভাবে আল্লাহর শত্রুদের ক্রোধান্বিত করছিল, যারা তাদের আক্রোশ বাড়িয়ে দিত ঐসব লোকদের প্রতি যারা আমাদের জানত, আমাদের বই পড়ত অথবা কোনভাবেই আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিল।

ফলে, আমাদের ভাইয়েরা সিক্রেট সার্ভিসের গোপন বন্দিশালায় বাস করতে লাগলেন, বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এমন সময় ব্যয় করলেন যা তাদের পূর্বে দুএকজন ছাড়া এদেশের আর কোন বন্দির বেলায় ঘটেনি। কেউ পুরো একবছর এভাবে রইলেন, অন্যরা কমপক্ষে ছয় মাস রইলেন। কর্তিপক্ষ দ্বারা বিভন্ন ধরনের শারিরিক ও মানসিক টর্চারের শিকার হলেন। তাদেরকে বাধ্য করা হল অনেক ভাইকে লুকিয়ে রাখতে যখন ইন্ট্যারন্যাশনাল কিছু অর্গানাইজেশন অনিয়মিত ভিজিটে আসত।

যাইহোক, এটা ছিল একটি অনন্য ও পবিত্র অভিজ্ঞতা যা অনেক ভাইকে শক্তিশালী করেছে। এরপর আমাদেরকে গোপন বন্দিশালা থেকে বের করে প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হল। আমাকেত উত্তরে 'কাফকাফা' জেলে প্রেরণ করা হয় যখন অধিকাংশ ভাইদেরকে দক্ষিণে সেন্ট্রাল জেল 'সুয়াকা'য় পাঠানো হয়। তাদের এই প্লান ছিল তাদের অভিলাষ আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দুর্বল করা থেকে। ۞ তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। (৮:৩০) জেলে পা দেয়ার মূহুর্ত থকেই আমি আগ্রহের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাথে আমার দাওয়াহ শুরু করলাম। তাই আমি কিছু রচনা লেখা শুরু করলাম যা ঐ সিরিজের অংশ ছিল যার নাম দিয়েছিলাম "হে কারাগারের দুই সঙ্গী! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?" (১২:৪৯

আয়াত থেকে নেয়া)। আমি বিভিন্ন সাবজেক্ট সেখানে অন্তর্ভূক্ত করি যেমন তাওহীদ, ইবরাহীমের পথ, ইবাদাত, বহু ইশশরবাদ ইত্যাদি। বন্দীদের মাঝে আমি এই বুকলেটগুলো বিলির চেষ্টা করি। এমনকি, কোন কোন রিলিজের সময় তা বাইরে নিয়ে যায়। জেলের বাইরে এসব বুকলেট তারা আমার নাম দিয়ে ছাপিয়ে দেয়। এটা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর শত্রুদের ক্রুদ্ধ করেছিল, এমতাবস্থায় কিছু মুক্ত ভাইয়েরা আমার লেখা সংগ্রহ করতে বন্দি ভাইদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। পরবর্তীকালে, আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, এসব সাবেক বন্দীরা জর্ডানিয়ান ইন্টেলিজেন্স অফিসের একটি অফিসে সশস্ত্র আক্রমণের অন্যতম সহযোগী হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ গ্রেফতার হয়েছিল এবং তারা স্বীকার করে জেলে আমার সাথে তাদের দেখা হয়, পরিচয় হয়। আমার কিছু রচনাও তাদের কাছে পাওয়া যায়। পরাক্রমশালী আল্লাহ এই ঘটনাকে একটি হেতু বানালেন আমাকে আমার ভাইদের সাথে পুনরায় মিলিত করতে। এই ঘটনার পরপরই আমাকে দক্ষিণের সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়।

অনুবাদ: আলি হাসান আলাইহি ওয়া সাল্লামন

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৯৬